চাঁদমামা
অক্টোবর ১৯৭২
৭০

Photo by : SURAJ N. SHARMA

রসেভরা...মনের মত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা!
PARLE POPPINS FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাম্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PP/ben

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

একজন পাঠক লিখেছেন : বাংলা ভাষায় 'চাঁদমামা'র আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। ছোট ও বড়—সকলের মন কাড়তে সমর্থ এই পত্রিকাখানি। বিষয়-বৈচিত্র্যে, পরিবেশন-গত চাতুর্যে, সর্বোপরি অসংখ্য ছবির বর্ণাঢ্য সমারোহে বাস্তবিকই 'চাঁদমামা' অনন্য, অতুলনীয়।

এই ধরণের বহু পত্র প্রতিদিন আমরা পাচ্ছি। পাঠকদের আনন্দ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

এবারের সংখ্যাতেও যক্ষপর্বত, মহাভারত ও শিবপুরাণ আছে। এক দিনের রাজা সকলের ভাল লাগবে। এ ছাড়া আছে ধানীলঙ্কা, পাঁচটি রুটির গল্প, বন্ধুত্ব, সন্দেহ-বাতিক, অপূর্ব-কঙ্কণ, যার কাজ তারে সাজে ও ন্যায়-যুদ্ধ এবং গণপতি ভট্ট।

খণ্ড ১ অক্টোবর ১৯৭২ সংখ্যা ৪

ধানীলঙ্কা

চার-পাঁচশো বছর আগেকার কথা! রাজস্থানে বানাজী নামে এক বালক ছিল। বাচ্চা বয়সেই তার বাবা মারা যাওয়ায় বানাজী কাকা এবং জ্যাঠাদের বাড়িতেই মানুষ হতে লাগল।

রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে যা যা শেখানো হয় তার প্রত্যেকটাই সে শিখল অল্প বয়সেই। ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া, তরবারি চালানো সব সে শিখল।

এক দেমাকী ঘোড়াকে কেউ বাগে আনতে পারছিল না। বানাজী সেই ঘোড়াকে বাগে এনে তার উপর চড়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাকা আর জ্যাঠাদের সাথে সেও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। সেই ঘোড়াটাও বানাজী বাদে অন্য কাউকে তার পিঠে চড়তে দিত না।

একবার এক ব্যবসায়ী কাশুলা থেকে কয়েকটা তরবারি বিক্রীর জন্য আনল। বানাজী সেই তরবারি গুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখল। কোনটা লম্বা কম, আবার কোনটা তেমন ধারালো নয়।

ছেলেটা তরবারি ঠিক চিনতে পারে ভেবে ঐ ব্যবসায়ী ভাল তরবারি একটা বের করে তার হাতে দিল।

সেই তরবারি পরীক্ষা করেই বানাজী বলল, "আমি ঠিক এই রকমটি চাই। এই রকম তরবারি আমার হাতে থাকলে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।"

বানাজী তার কাকা-জ্যাঠাকে ঐ তরবারি কিনতে বলল।

"আমরা বেঁচে থাকতে তরবারি দিয়ে তুমি কী করবে?" বানাজীর জ্যাঠা বলল।

"এই তরবারি অনেক বড়। তুমি তো

রাজকুমার দত্ত

এটা ভাল করে নাড়তেই পারবে না।" বলল বানাজীর কাকা।

"বারে আমি বড় হচ্ছি না ? আমার তরবারিটা খুব ছোট।" বলল বানাজী।

"ওরে পাগলা ছেলে, তরবারি বড় হলেই হয়না, সেই তরবারি ধরার মত শক্তি আর সাহসও চাই। তরবারি ছোট থাকলে একটু এগিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়।" বলল বানাজীর জ্যাঠা।

বানাজী নিরাশ হয়ে ঐ তরবারি ব্যবসায়ীকে ফেরত দিল।

কিছুদিন পরে এক লুণ্ঠনকারীর দল বানাজীর গ্রামে ঢুকে সমস্ত গরু নিয়ে পালাতে লাগল। কেউ লুণ্ঠন করতে গ্রামে ঢুকলে গ্রামের লোক ঢাক-ঢোল পেটানো রেওয়াজ। কাকা-জ্যাঠাদের বাড়িতে বসে বানাজী সেই ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শুনল। সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে লুণ্ঠনকারীর দল গ্রামে ঢুকে গরু নিয়ে পালাচ্ছে।

বানাজী মনে মনে বলল, এত বড় একটা কাণ্ড গ্রামে ঘটে যাবে আর আমি ঘরে বসে থাকব ! এত বড় অপমান।

বানাজী তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে খাপখোলা তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লুণ্ঠনকারীদের ধাওয়া করল।

খুঁজে খুঁজে অবশেষে অরণ্যের এক প্রান্তে বানাজী ঐ লুণ্ঠনকারীদের দেখল।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা বানাজীকে বলল, "ওরে ছোকরা, তোর তো গোঁফ-

দাড়ি ওঠেনি, তুই পারবি কি করে এতগুলো গরু ফেরত নিয়ে যেতে ?"
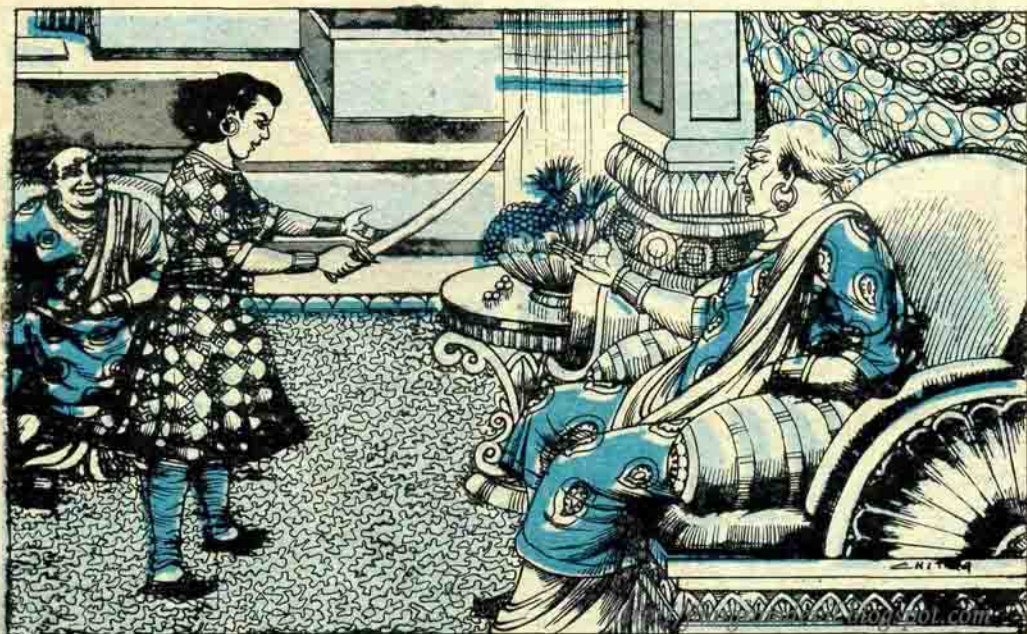
বানাজী বুঝল কথায় চিড়ে ভিজবে না। তাই সে নিজের ঘোড়াটাকে লুণ্ঠনকারী নেতার কাছে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ তার মাথার উপর তরবারি চালিয়ে দিল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা তৎক্ষণাৎ মাথা সরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও তার নাক, মুখ কেটে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল, "ঐ কুকুরের বাচ্চাটাকে মেরে ফেল! ধর! ওকে টুকরো টুকরো করে ফেল।" নেতা আর্তনাদ করে উঠল।

সেই হুড়োহুড়ি আর চিৎকারের মধ্যে গরুগুলো সব গ্রামের দিকে টেনে ছুটতে লাগল। বানাজীও বুঝল লুণ্ঠনকারীদের সবাইকে সে জব্দ করতে পারবে না। তাই সে আর দেরি না করে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

লুণ্ঠনকারীরা বানাজীকে ধরার জন্য পিছু পিছু ছুটলো বটে কিন্তু বানাজীর ঘোড়ার তীব্র গতির ফলে তারা কেউ তার নাগাল পেল না।

গরু হারিয়ে যারা কাঁদতে বসে ছিল তারা নিজেদের গরু ছুটতে ছুটতে ফেরত আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল। বানাজীকে দেখে তাদের বুক আনন্দে ভরে উঠল।

কেউ বুঝতে পারল না অত কম বয়সী বানাজী কেমন করে লুণ্ঠনকারীদের কবল থেকে গরুগুলোকে ছাড়িয়ে আনল।

সব ঘটনা জানতে পেরে বানাজীর কাকা-জ্যাঠারা বলল, "এখন থেকে তোমার এসব ব্যাপারে ছোটাছুটি করা কেন রে বাবা! আরও বড় হও। তারপর তোমার বীরত্ব আরও ভাল করে দেখাতে পারবে। অনেক সুযোগ পাবে।"

"ছোট হলেই বা, কি হয়েছে ? আমি তো ধানীলঙ্কা। ধানীলঙ্কা ছোটতেই ঝাল হয়।" ওর কথা শুনে আনন্দে ও গর্বে সবাই হেসে উঠল।

পাঁচটি রুটির গল্প

দুজন যাত্রী। একজনের নাম সোমনাথ। অন্যের নাম কাশীনাথ। অনেক দূরের যাত্রী ওরা। পথে সোমনাথ উঠলো এক ঠানদির বাড়ি। কাশীনাথও উঠলো ঐ ঠানদির বাড়ি। ঐ ঠানদি ছিলো যাত্রী-দের উপকারী ঠানদি। এক ডাকে সবাই চিনতো ঠানদিকে। রাত্রে ঠানদির বাড়ি ঘুমিয়ে সকালে উঠে সোমনাথ আর কাশীনাথ যাত্রা শুরু করলো।

ওদের যাওয়ার আগে দুজনের পোঁট-লায় ঠানদি মোটা মোটা রুটি বানিয়ে পুরে দিলো। সোমনাথের মন উদার। কাশীনাথ খুব হিসেবী ও কৃপণ। তাই ঠানদি সোমনাথের পোঁটলায় তিনটে রুটি এবং কাশীনাথের পোঁটলায় দুটো রুটি পুরে দেয়।

ওরা দুজন একই পথের যাত্রী। পাশাপাশি ওরা হাঁটছে। মাথার উপর সূর্য। ওদের খিদে পেয়ে গেছে। ওরা দুজনে পুকুরঘাটে গেলো।

দুজনে মুখ-হাত-পা ধুয়ে রুটি খেতে গাছের ছায়ায় বসলো। পুঁটলি খুলে দেখে সোমনাথের পুঁটলিতে তিনটে আর কাশীনাথের পুঁটলিতে দুটো রুটি আছে।

"দেখলেন, ঠানদি নাকি যাত্রীদের বন্ধু। কতখানি পক্ষপাতিত্ব। আপনাকে তিনটে রুটি দিয়ে আমাকে দিলো মাত্র দুটো।" বলল কাশীনাথ।

সোমনাথ বলল, "যা মোটা মোটা বড় বড় রুটি, দুটোই খেতে পারবো না। ঠিক আছে খান না। কম পড়লে পাঁচটা রুটি দুজনে সমান ভাগ করে খাবো।"

এই কথায় কাশীনাথ খুশি হলো। দুজনে রুটি খেতে যাবে এমন সময় ঐ গাছের ছায়ায় আর একজন যাত্রী এলো। নাম তার রামনাথ। রামনাথ দেখল

রত্নেশ্বর চৌধুরী

ওদের দুজনের কাছেই খাবার রয়েছে।

"মশাইরা, আমিও আপনাদের মতো যাত্রী। খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু আমার কাছে খাবার নেই। তাই আপনাদের খাবার থেকে কিছুটা আমাকে দিলে ঋণী থাকবো।" রামনাথ বলল।

"আমাদের কাছে যে রুটিগুলো আছে তাতে তিনজনের হয়ে যাবে।" সোমনাথ বলল। সোমনাথের ঐ কথার পিঠে কাশীনাথ আর অন্য কথা বলে নি!

রামনাথ ঝটপট খেতে বসে গেলো। তিনজনে পাঁচটি রুটি খেলো। পুকুরের জল খেলো। ওদের পেট ভরে গেলো।

রামনাথ ওদের দুজনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হঠাৎ সোমনাথের হাতে কিছু পয়সা দিতে গেলো। সোমনাথ নিতে রাজী হলো না। রামনাথ ওর কথা কানে না তুলে পাঁচ আনা সোমনাথের হাতে গুঁজে নিজের পথে চলে গেলো।

সোমনাথ ঐ পাঁচ আনার মধ্যে দু আনা তুলে কাশীনাথের হাতে দিতে দিতে বলল, "আপনার ভাগ আপনি নিন। আমার তিনটে রুটি আর আপনারতো দুটো রুটি, তাই পাঁচ আনার মধ্যে আপনাকে দু আনা দিচ্ছি।"

"এ ভারি অন্যায়। রামনাথ আমাদের দুজনের খাবার খেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে পয়সা দিয়েছে। এতে আমাদের দুজনেরই সমান ভাগ আছে। আমি আরও আধ-আনা পাবো। দয়া করে দিন।" বলল কৃপণ কাশীনাথ।

সোমনাথের কাছে আধআনা বড় কথা নয়। দিতে পারতো। কিন্তু কাশী-নাথের হিসেব করার ঢঙএ তার গা জ্বালা করলো।

"ঠিক আছে চলুন। কাছেই গ্রাম আছে। সেখানে বিচারকের কাছে যাবো। উনি যে রায় দেবেন সেটাই মেনে নেবো।

বিচারপতি ওদের দুজনের কথা শুনে বলল, "আমার বিচারে রামনাথ যে পাঁচআনা দিয়েছে তার মধ্যে চারআনা

পাবে সোমনাথ। আর কাশীনাথ পাবে একআনা। এখন সোমনাথকে একআনা ফেরত দাও।"

বিচারের কথা শুনে কাশীনাথ থ বনে গেলো। কোথায় ভেবেছিলো আধ-আনা পাবে এখন দেখছে উল্‌টে এক-আনা সোমনাথকে ফেরত দিতে হবে!

"মশাই, এ-কি বিচার করলেন? আমাদের যার যতগুলো রুটি ছিলো সে আমার মতে তত আনা পাবে। আর আপনি বলছেন একআনা মাত্র পাবো!" কাশীনাথ বিচারককে বলল। বিচারক বলল, "ঠিক বলেছি। আমার বিচারের আগে ঐ পাঁচটি রুটি আপনারা কি ভাবে ভাগ করেছেন, ভেবেছি।"

"আজ্ঞে, এক একটা রুটিকে তিনটে করে ভাগ করেছি। পাঁচটা রুটিতে পনেরটি ভাগ হয়েছে। তার থেকে এক-এক-জন পাঁচটি করে টুকরো খেয়েছি।" বলল কাশীনাথ।

বিচারক বলল, "বেশ, সত্যি কথা বলো দেখি তুমি নিজের রুটি কটা টুকরো করেছো?"

"আজ্ঞে, আমার দুটো রুটিতে ছটা টুকরো হয়েছে।" কাশীনাথ বলল।

"তার মধ্যে পাঁচটি টুকরো তুমি নিজেই খেয়েছো। রামনাথকে দিয়েছো মাত্র একভাগ। আর সোমনাথের ছিলো তিনটে রুটি। তিনটেতে ন'টা ভাগ হয়েছে। তার থেকে চার ভাগ সে রাম-নাথকে খেতে দিয়েছে। নিজে খেয়েছে পাঁচটি। রামনাথ যে পাঁচটি টুকরো খেলো তার মধ্যে চারটে টুকরো সোম-নাথের। অতএব রামনাথের দেয়া পাঁচ আনার মধ্যে চারআনা পাবে সোমনাথ আর তুমি পাবে একআনা।' কি ন্যায় বিচার করিনি?" বিচারক বলল।

কাশীনাথ অগত্যা সোমনাথকে এক-আনা ফেরত দিতে গেলো। সোমনাথ তা না নিয়ে বলল,"কথায় কথায় বিচারকের কাছে ছুটে গেলে এই হয়। সব জায়গায় নিজের হিসাব চলে না।"

তাব ন্মহতাম্ মহিমা
যাব ন্ন কিমপি হি যাচ্যতে লোকঃ,
বলি মনুযাচন সময়ে
শ্রীপতি রপি বামনো জাতঃ।   ॥১॥

[বড়দের মহিমা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না সে যাচনা করছে। বলিচক্রবর্তীর কাছে যাচনা করে লক্ষ্মীদেবীর পতি বামন হয়ে গেলেন।]

মাতা নিন্দতি, নাভি নন্দতি পিতা,
ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ,
কান্তাপি নালিঙ্গতে,
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরূতে
সল্লাপমাত্রম্ সুহৃৎ
তস্মা দর্থ মুপার্জয় শ্রূ নিসখে
হ্যার্থেন সর্বে বশাঃ।   ॥২॥

[মা দরিদ্রকে নিন্দা করে, পিতা তার উপর প্রসন্ন থাকে না, ভাইরা তার সাথে কথা বলে না, চাকর তার উপর তুষ্ট থাকে না, পুত্র তার কাছে থাকতে চায় না, স্ত্রী তাকে দূরে রাখতে চায়, বন্ধু দূরে দূরে থাকে পাছে দরিদ্র বন্ধুটি টাকা চেয়ে বসে। ধন থাকলে সবাই অধীনে এসে যায়। তাই, প্রত্যেকের ধন উপার্জ্জন করা উচিত।]

ধণের মহিমা

যক্ষপর্বত

তিন

[লুণ্ঠনকারীরা স্বর্ণাচারিকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল। ঘনবনে অবস্থিত যুবকদের কুটিরের ঠিকানা স্বর্ণাচারির কাছ থেকেই জেনে নিল। যুবকদ্বয়ের গাইবাছুর নিয়ে যাওয়ার সময় বিঘ্নেশ্বর পূজারী যুবকদের পোষা সিংহকে লুণ্ঠনকারীদের পিছনে লেলিয়ে দিল। সিংহ এক লাফে লুণ্ঠনকারীর গলা টিপে ধরল। তারপর...]

হঠাৎ সিংহ লুণ্ঠনকারীদের একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায় লুণ্ঠনকারীদের নেতা চমকে উঠল। লুণ্ঠন-নেতা মুহূর্তকাল ভেবে হাতের বল্লমটি উঁচুতে তুলে ধরে সিংহের দিকে ছুঁড়ে মারল। বল্লমটি সিংহের এক বিঘত দূরে মাটির গভীরে গেঁথে গেল। ফলে, সিংহ ভীষণ ভাবে রেগে গিয়ে প্রবল বিক্রমে লুণ্ঠনকারীর গলা টিপে ধরে এদিক-ওদিক টেনে হিঁচড়ে জমিতে ফেলে রগড়াতে লাগল।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা একবার চার-দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার একজন অনুচর সিংহের কবলে পড়েছে আর ঐ অনুচরের উট ক্ষত্রিয় যুবকদের কুটিরের পিছনের দিকের জঙ্গলে পালাচ্ছে। অন্য অনুচরের উটের উপর স্বর্ণাচারিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। স্বর্ণাচারি আর্তনাদ করে উঠল, "আমাকে

বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও !"

লুণ্ঠন-নেতা বুঝতে পারল যে সিংহের কবল থেকে সে তার অনুচরকে রক্ষা করতে পারবে না। সিংহের মুখে পড়া লুণ্ঠনকারীটি দু-একবার চেঁচিয়েই চুপ মেরে গেল। তারপর সিংহ তাকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে, ছেড়ে দিয়ে, পিছনের পা দুটো মুড়ে বসে একবার ঐ লুণ্ঠন-নেতার দিকে আর একবার ঐ গরুটির দিকে তাকাতে লাগল।

সিংহের চোখ আর তার ভাবগতিক দেখে লুণ্ঠন-নেতা ভাবল, এরপর হয় তার উপর নয় তার অনুচরটির উপর সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরক্ষণেই সে ভাবল সিংহ খাবার জন্য গাইটার উপরেই আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই, তার ধারণা হল গাইটাকে ছেড়ে দিলে তারা সিংহের কবল থেকে মুক্তি পাবে।

একথা ভেবে লুণ্ঠন-নেতা ঐ অনুচর-টিকে বলল, "আরে এই হাঁদা, তোর বোকামীর জন্যই আমাদের একজন অনুচর সিংহের মুখে প্রাণ হারাল। সিংহ-গর্জন শোনার সাথে সাথে তুই গরুটাকে ছেড়ে দিলে এত বড় বিপদ ঘটত না। সিংহ গরুটাকে মুখে তুলে নিয়ে সোজা জঙ্গলে চলে যেত। এখনও তুই গরুটাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে। তোর ঘটে যে কিছু আছে তার প্রমাণ দে!" আর্তনাদকারী স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে লুণ্ঠন-নেতা বলল, "আরে এই বাস্তুঘুঘু! তুই চুপ করবি না তোকে উটের পিঠ থেকে সিংহের মুখে ঠেলে ফেলে দেব?" বলল লুণ্ঠন-নেতা।

এই প্রশ্ন শুনে স্বর্ণাচারির মনে দারুন আনন্দ হল। ক্ষত্রিয় যুবকদের পোষা সিংহ তাকে ভালভাবেই জানে, চেনে। সেই সিংহ তাকে কিছুই করবে না। তাই স্বর্ণাচারি ভীষণ ভয় পাওয়ার মত অভি-নয় করে বলল, "হে উষ্ট্রনায়ক, আমাকে সিংহের মুখের কাছে ছুঁড়ে দাও। আমি সিংহের পেটে যদি চলে যাই ক্ষতি নেই

অন্তত সেই ভাবেও জন্মভূমিতে আমি মরতে পারব। জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় জিনিস আর কী আছে।

সেই মুহূর্তে লুণ্ঠন-নেতার মনে হল, স্বর্ণাচারিকে উটের উপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়াই ভাল হবে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বর্ণাচারির মৃত্যুর কথা উঠতেই পাহাড়ের পাদদেশে তার রাজধানী তৈরি করার কথাও মনে পড়ল। সেইজন্য সে তার অনুচরকে বলল, "ওরে হেই, ঐ বাস্তুঘুঘুটিকে সিংহের মুখে এখানে ঠেলে দিস নি। আমরা যে নগরী তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা তৈরির ব্যাপারে ওর সাহায্য ভীষণভাবে প্রয়োজন হবে। সেখানে সে আমাদের কথা ঠিক মত না শুনলে, তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেকড়েকে খেতে দেব।" সেই কথা শুনে স্বর্ণাচারির মনে সত্যি সত্যি মৃত্যু-ভয় জাগল। সে তখন সিংহের দিকে ফিরে "ভীম, ভীম," বলে চিৎকার করে, "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও", বলতে লাগল।

পোষা সিংহের নাম ছিল ভীম। নিজের নাম কানে যেতেই সিংহ গর্জন করতে করতে উঠে একবার গা ঝাড়া দিয়ে স্বর্ণাচারির বসে থাকা উটের দিকে ছুটল। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাত্মক বিপদের কথা

ভেবে লুণ্ঠনকারী গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে উটকে তাড়া দিল। উট ভুট্টার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগল। তার পেছনে পেছনে লুণ্ঠন-নেতাও নিজের উটকে আরও দ্রুত ছোটাল।

যা কিছু ঘটছে তার সবটাই বিঘ্নেশ্বর পূজারী কুটিরের পেছন থেকে দেখছিল। জীবনে সুখে দুঃখে যে স্বর্ণাচারিকে সদা-সর্বদা পেয়েছে সেই সাথীকে এভাবে লুণ্ঠনকারীদের ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখে তার মনে ভীষণ দুঃখ হল। সময়-মত ক্ষত্রিয় যুবকরা কুটিরে থাকলে এই বিপদ ঘটত না। বিঘ্নেশ্বর পূজারী এই সব কথা ভাবছিল এমন সময় ঐ ক্ষত্রিয়

যুবকদ্বয় শিকার সেরে নিজেদের কুটিরের দিকে ফিরছিল। সেই দিন ওরা ভাল শিকার পেল। একজন যুবকের কাঁধে একটি হরিণ ঝুলছিল। অন্য যুবকের কাঁধে দুটো বুনো মুরগি আর হাতে চারটে খরগোশ ঝোলান ছিল। ওরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল।

ঐ যুবকদ্বয় কুটিরের দিকে হাঁটার সময় সিংহ মৃদু গর্জন করতে করতে যুবকদের কাছে এসে ওদের একজনের পা জড়িয়ে ধরল। সিংহকে খাঁচার বাইরে দেখে যুবকরা আশ্চর্য হয়ে গেল। শিকার করতে যাওয়ার সময় ওরা সিংহকে খাঁচায় আটকে রেখে গিয়ে ছিল। এখন সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো কি করে! কোন হতভাগাকে আমাদের এই সিংহটা মেরে ফেলেনিতো! খাঁচা থেকে এতো বেরোতেই পারেনা। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে অবশেষে ওরা হতবাক হল।

যুবকদ্বয় একে অন্যের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় গাছের আড়াল থেকে বিঘ্নেশ্বর বেরিয়ে এসে বলল, "হে মহাবীরদ্বয়, বিরাট মারাত্মক সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

সেকথা শুনে মুহূর্তের জন্য যুবকদ্বয় থমকে গেল। ওদের মধ্যে একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পূজারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি বলছ তুমি? সর্বনাশ, সর্বনাশ বলে চেঁচাচ্ছ কেন? তুমি আছ, আমরা আছি, এই বনও আছে, সর্বনাশটা তাহলে হল কোথায়? সর্বনাশ হল কার? আমরা অবাক হচ্ছি এই সিংহশাবক খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ল কি করে? তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছে?" কথা বলতে বলতে যুবকটি সিংহকে সামলাচ্ছিল।

বিঘ্নেশ্বর তাড়াতাড়ি অল্প কথায় যুবকদ্বয়কে এতক্ষণ কুটিরের কাছে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল তা জানিয়ে বলল, "হে খড়্গবর্মা, হে জীবদত্ত, এখানে সময় নষ্ট না করে কুটিরের কাছে চল।

ভীমের থাবা খেয়ে সেখানে মরে পড়ে আছে একজন লুণ্ঠনকারী। দেখবে চল। ঈশ্বরের কৃপায় গাইবাছুরকে ফিরে পেয়েছি।"

পূজারী, কথা শুনে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্তের একদিকে যেমন খুব বিস্ময় জাগল তেমনি অন্যদিকে প্রচণ্ড ঘৃণাও জাগল। ওরা জানত ওদের বাসস্থানের অরণ্যে আরও অনেক আদিম-জাতি আছে কিন্তু ওরা এতদিন উটবাহী কাউকে দেখেনি। এ হেন অবস্থায় উটে বসে একদল লুণ্ঠনকারী তাদের কুটিরে আসাই নয়, এসে দিব্যি তাদের অতিথি স্বর্ণাচারিকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়ায় তাদের মনে ওদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জাগল।

"জীবদত্ত, আর এক মুহূর্ত আমাদের এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পূজারীতো আমাদের জানিয়েছে ঐ লুণ্ঠনকারীরা কোন্ দিকে গেছে। আমরা এক্ষুণি চল বেরিয়ে পড়ি, স্বর্ণাচারিকে উদ্ধার করি আর ঐ লুণ্ঠনকারীদের খতম করি!" এই কথা বলে খড়্গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করল।

জীবদত্ত নিজের বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে, বলল, "খড়্গবর্মা, আগেপিছে না ভেবে শত্রুকে আক্রমণ করলে বিপদ হতে

পারে। শত্রুদের সংখ্যা জানতে হবে। আমাদের কুটিরে ঐ লুণ্ঠনকারীদের ঢোকার পেছনে কোন রহস্য আছে কিনা জানতে হবে। এই সব ব্যাপার খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। কোথাকার কোন্ দেশের বাহন উটকে লুণ্ঠনকারীরা এই অরণ্যে আনল কেন? ···যাক্, আগে চল কুটিরে ঢুকে ওরা কি কি নিয়ে গেছে দেখি, তারপর আমরা ঠিক করব আমাদের কর্তব্য।"

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত এগিয়ে চলেছে। পেছনে যেতে যেতে বিঘ্নেশ্বর বলল, "হে যোদ্ধাগণ, এই যে, এই পাশের জঙ্গলে পড়ে আছে একজন

লুণ্ঠনকারী। ভীমের থাবা খেয়ে লোকটা পটল তুলেছে।

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত ঐ মৃত-দেহের কাছে গেল। খড়্গবর্মা পা দিয়ে ঐ মড়াটাকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে দেখল। জীবদত্ত মড়ার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এই লোকটা ঠিক বুনো জাতের নয়। এর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এ কোন দূর দেশের অধিবাসী।"

"এ লোকটা বেঁচে থাকলে এর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যেত। বেচারা ভীম কি করে বুঝবে। রাগের চোটে ওর গলা ঝাপটে ধরেছে।" বলল খড়্গবর্মা।

তারপর যুবকদ্বয় কুটিরের ভিতর ঢুকল। কুটিরের সমস্ত জিনিস তছনছ করা আছে। দরজার কাছে টাঙ্গানো ধনুক এবং তূণ তারা দেখতে পেল না। "আমাদের এই সব জিনিস যখন নিয়ে গেছে, ওদের আর ছাড়া যায় না। ধরতেই হবে। ওরা যে কোত্থেকে এলো এবং কোন্‌দিকে গেল তা এখানকার গণ্ডক জাতের লোক কেউ-না-কেউ দেখেছে নিশ্চয়।" জীবদত্ত বলল। পরক্ষণে পূজারীর দিকে ঘুরে জীবদত্ত বলল, "বিঘ্নেশ্বর, তুমি গিয়ে আশেপাশে গণ্ডক-জাতের কাউকে দেখতে পেলে তাকে এখানে নিয়ে এসো।"

কুটিরের বাইরে পা রাখতেই পূজারী দেখতে পেল গণ্ডকজাতের নেতা অরণ্য-মাল্লু, তার অনুচরদের সাথে, লুণ্ঠন-কারীদের বাহন, তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে বলতে চলেছে। তা দেখে বিঘ্নেশ্বর পূজারী তাদের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল, "ক্ষত্রিয় যুবকেরা এক্ষুনি শিকার থেকে ফিরেছে। উটের উপর বসে আসা লুণ্ঠনকারীদের আপনারা কেউ এখন দেখেছেন? ওরা আমার প্রাণের বন্ধু স্বর্ণাচারিকে ধরে নিয়ে গেছে।"

এ-কথা শুনে অরণ্যমাল্লুর চেহারা

ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, "কী বলছ পূজারী, আমরা কি শুধু ওদের দেখেছি, ওরা যে আমাদের ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে, হেরে গিয়ে পালাচ্ছি। ওদের এক বিচিত্র জীবের পিঠে স্বর্ণাচারিকে চেপে যেতে আমার অনুচররা দেখেছে। খড়্গবর্মা অথবা জীবদত্ত তখন এখানে থাকলে ওদের একজনও প্রাণে বেঁচে যেতে পারত না।"

বাইরের কথাবার্তা কানে যেতেই খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত কুটিরের বাইরে এলো। অরণ্যমাল্লু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, বিরাট বিপদে পড়ে গেছি। ঐ লুণ্ঠনকারীরা ফসল নিয়ে গেছে। যে গণ্ডক জাতের লোক পরাজয় কাকে বলে জানত না, তারা সবাই কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, পালিয়ে এলো অরণ্যপুরে। এখন আপনারাই ভরসা।"

অরণ্যমাল্লুর কথা শুনে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত বুঝল ঐ উটের উপর চড়ে আসা লোকগুলোর কাজই লুণ্ঠনকরা। ওরা এ কথা ভেবে আশ্চর্য হল যে ঐ লুণ্ঠনকারীরা শুধু যে সাহসের সাথে গণ্ডকজাতের লোককে মোকাবিলা করল তাই নয় ওদের পরাজিতও করল। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

"তুমি রাজা হয়ে ঐ লুণ্ঠনকারীদের ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে! তোমার

কাপুরুষতা দেখে তোমার অনুচরেরা কী ভাববে!" রেগে গিয়ে খড়্গবর্মা বলল।

"আজ্ঞে আমি পালিয়ে এসেছি ঠিক। কিন্তু রাজা ওদের আক্রমণ করতে আসেনি।" বলতে বলতে মন্ত্রী শিলামুখী এগিয়ে এলো।

"তাহলে ওরা কি কোন নতুন অস্ত্র তোমাদের উপর প্রয়োগ করেছে? না-কি ঐ উটদের দেখে তোমাদের গণ্ডারগুলো ভয়ে ছুটে পালিয়েছে?" জিজ্ঞেস করল জীবদত্ত।

শিলামুখী সেই পাহাড়-জঙ্গলের পাদ-দেশে যা কিছু ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা ওদের শুনিয়ে বলল, "ঐ লুণ্ঠনকারীদের কাছে বল্লম ও তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু যে জীবের নাম আপনি উট বলছেন, সেগুলোকে দেখে কেন জানিনা আমার লোক ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ঐ ধরনের জন্তু আমরা কোনদিন দেখিনি। তাই ওটাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছে!"

"যাক যা হবার হয়েছে। এখন স্বর্ণাচারিকে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। শুধু তাই নয় ঐ দুরাত্মারা যাতে এ পথ আর কোনদিন না মাড়ায় তার জন্য উচিত শিক্ষা ওদের দিতে হবে। তোমাদের কয়েকজন দেখে এসো ওরা কোন্ দিক দিয়ে কতদূর গেল। আমরা দুজনে সূর্যাস্ত হতে দুএক দণ্ড বাকি থাকতে এখান থেকে রওনা দেব।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শেষ হতেই অরণ্য-মাল্লু তার চারজন অনুচরকে কাছে ডেকে ঐ লুণ্ঠনকারীদের গতিবিধি ভাল করে দেখে আসার হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ ঐ চারজন গণ্ডারের পিঠে চড়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে লাগল।

(চলবে)

বন্ধুত্ব

জেদী বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেল। গাছে উঠে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে হাঁটতে লাগল। মুখে কোন কথা নেই। শব থেকে বেতাল বলল, "মহারাজ, স্বর্গসুখ পাওয়ার আশাতেই তুমি যদি এত পরিশ্রম করে থাক তাহলে তোমার এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। কারণ অত্যন্ত খারাপ লোকও স্বর্গে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ছোট্ট কাহিনী বলছি। শুনলে হয়ত হাঁটার পরিশ্রম কমে যাবে।"

বেতাল বলতে শুরু করল : কাশীতে এক গুরুকুল ছিল। সেই গুরুকুল বা আশ্রমে পড়ার জন্য নানান দেশের ব্রহ্মচারী ছাত্র আসত। একবার ঐ আশ্রমে পড়তে এলো তেজ সিং নামে এক দশ বছরের ছেলে। হুঁশিয়ার ছেলে। পড়া সেরে প্রত্যেক দিন সে যজ্ঞের কাঠ

বেতাল কথা—চতুর্থ

আনত দূরের জঙ্গল থেকে।

সেই জঙ্গলে অঘোরদাস নামক এক ছেলের সাথে তেজ সিং-এর আলাপ হল। প্রত্যেকদিন অঘোরদাস সেই জঙ্গলের নানান কাহিনী তেজ সিংকে বলত। অঘোরদাসের বাবা সেই জঙ্গলের নেতা। সে ছিল নিপুণ লুণ্ঠনকারী। গোটা নগরে ডাকাত হিসেবেও তার নাম ডাক ছিল। অঘোরদাসের বাবা লুটপাট করে যা আনত তা সেই জঙ্গলবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিত।

অঘোরদাসের বাবা ও তার দলের লোকের কাজকর্ম তেজ সিং-এর ভাল লাগল না। সে তার বন্ধু অঘোরদাসকে বলল, "বন্ধু, বড় হয়ে তুমিও কি তোমার বাবার মতো ডাকাত হবে? সামাজিক জীবন তোমার ভাল লাগে না?"

"কত পুরুষ ধরে আমরা নাকি এই জঙ্গলে ডাকাতি আর লুটপাট করে আসছি। আমি হঠাৎ এসব বদলাতে পারব? তোমার শিক্ষা, তোমার পরিবেশ আলাদা। আমার পরিবেশের কথাতো তোমাকে বললাম। এখন তোমাকে যদি বলি, তুমি আমাদের মত জীবনযাপন কর, পারবে? আমার বেলাতেও একই অবস্থা।" অঘোরদাস জবাবে বলল।

ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে আচার-আচরণের অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কয়েক বছর পর তেজ সিং লেখাপড়া

শেষ করে বাড়ি ফেরার আগে অঘোর-দাসের সাথে দেখা করল ঐ জঙ্গলে। তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

তারপর একদিন কাশীরাজের দরবারে তেজ সিং চাকরি পেল। ওদিকে ঐ জঙ্গলের ডাকাত অঘোরদাসের বাবা মারা গেল। জঙ্গলবাসী অঘোরদাসকে তাদের নেতা করল। অঘোরদাস লুটপাট আর ডাকাতিতে অল্পদিনের মধ্যেই বাপকে ছাড়িয়ে গেল।

অঘোরদাসের দুঃসাহসিক ডাকাতি আর লুটপাটের ফলে যে সব ব্যবসায়ীরা কাশী যাতায়াত করত তারা অঘোর দাসের নামে ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল। তাকে ধরার জন্যে কাশীরাজ অনেকবার নানান ধরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। জঙ্গলবাসীরা জানপ্রাণ দিয়ে অঘোর-দাসকে বাঁচাত। কাশীরাজের লোক কোনক্রমেই তাদের কাছে পেরে উঠত না। শেষে কাশীরাজ পুরস্কার ঘোষণা করল: যে অঘোরদাসকে ধরে দেবে তার সাথে রাজ-কন্যার বিয়ে হবে এবং তাকেই সিংহাসনে বসানো হবে। এই ঘোষণা শুনে বহু যোদ্ধা অঘোরদাসকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হল।

বাল্যবন্ধুর লুটপাটের কথা শুনে তেজ সিং ভীষণ দুঃখ পেল। তার মনে হল খুব জোর দিয়ে চেষ্টা করলে সে হয়ত অঘোরদাসকে সামাজিক জীবনে টেনে আনতে পারত। উঠে পড়ে চেষ্টা

করলে হয়ত অঘোরদাস বদলে যেত। এখন অঘোরদাসকে সে বাদে আর কেউ ধরতে পারবে না। ঐ জঙ্গলের আনাচে-কানাচে তার ঘোরা আছে। তবু বহুকাল তেজ সিং অঘোরদাসকে ধরার কোন চেষ্টা করল না।

চোখের সামনে তেজ সিং দেখতে পেল রাজধানীর ব্যবসায়ীরা বাইরে যেতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। বাইরের ব্যবসাদারও ভয়ে কাশীতে আসতে পারছে না। ফলে কাশীবাসীর জীবনে দারুন অভাব অনটন দেখা দিল।

এই অবস্থায় দেশের মানুষকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তেজ সিং ঠিক করল, বাল্যবন্ধু অঘোরদাসকে বন্দী করবে। অল্প সংখ্যক সেনাদের নিয়ে তেজ সিং ঐ জঙ্গলে ঢুকল। ঠিক সেই সময়ে অঘোরদাস মহাশক্তির পূজা সারতে ব্যস্ত। তাকে বন্দী করে তেজ সিং তাকে কাশীরাজের সামনে হাজির করল। রাজাও নিজের ঘোষিত কথা অনুসারে তেজ সিং-এর সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল এবং রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করল।

তেজ সিং অঘোরদাসের আজীবন কারাবাসের শাস্তি দিল। অঘোরদাস যাতে ভাল খাবার এবং ভদ্র ব্যবহার পায় তার ব্যবস্থা করল। অঘোরদাসের বন্দী হওয়ার পর ঐ অঞ্চলে লুটপাটও বন্ধ হয়ে গেল। বহু বছর পর বুড়ো হয়ে অঘোরদাস মারা গেল।

তেজ সিং রাজা হিসেবে বেশ নাম করল। প্রজারাও তার শাসনে ভালই ছিল। তেজ সিং রাজা হিসেবে যতটা পারল প্রজাদের উপকার করল।

কয়েক বছর পরে তেজ সিংও মারা গেল। তেজ সিং মারা গিয়ে স্বর্গে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, স্বর্গে গিয়ে তেজ সিং তার বাল্যবন্ধু অঘোরদাসকে পেয়ে খুব খুশী হল। স্বর্গে ওদের বন্ধুত্ব দিনকে-দিন আরও গভীর এবং মধুর

হতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, অঘোরদাস ডাকাত, লুণ্ঠন-কারী, পাপী আবার তেজ সিং বাল্য-বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেও পাপী হয়ে গেল। এহেন দু'জন পাপীর কি ভাবে স্বর্গপ্রাপ্তি হল? তেজ সিং-এর শিক্ষা শেষ হবার পর এ বন্ধু দুজনের পথ আলাদা হয়ে ছিল, স্বর্গে গিয়ে আবার ঐ দুপথের মিল হল কি করে? ওদের বন্ধুত্ব কেন নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল? এসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এ-কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বলল: তেজ সিং এবং অঘোরদাস আলাদা দুটো পথের পথিক ছিল। ওদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনধারাও ছিল ভিন্ন। নিজের নিজের পথে চলা পাপ নয়। জঙ্গলবাসীর নেতা হিসাবে অঘোরদাস লুটপাট আর ডাকাতি করে নিজের দল বা জাতের লোকের মধ্যে ঐ সব লুন্ঠিত সম্পত্তি ভাগ করে, সেই লোকগুলোকে বাঁচিয়ে, পূণ্য কাজ করেছে। একই ভাবে তেজ সিং অঘোরদাসকে বন্দী করে সমাজে লুটপাট এবং ডাকাতি বন্ধ করে পূণ্য কাজ করেছে। সে রাজকুমারীকে পাওয়ার জন্য অথবা রাজত্ব পাওয়ার জন্য অঘোরদাসকে বন্দী করে নি। তাই, দুজনের স্বর্গপ্রাপ্তি হল। বাকি রইল বন্ধুত্বের প্রশ্ন। বন্ধুত্ব ঐ দুজনের নিজে-দের ব্যাপার। তার সাথে সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। নেই বলেই ছাত্র জীবনেই তেজ সিং-এর সাথে অঘোরদাসের বন্ধুত্ব হল। এই লোক ছেড়ে যাওয়ার পর শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্নই থাকে। সামাজিক কোন ব্যাপার থাকে না। সেই কারণেই স্বর্গে ওদের বন্ধুত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। এবং দিনকে-দিন তা গভীর হতে লাগল।

রাজার মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে পালিযে আবার ঐ গাছে গিয়ে উঠল। (কল্পিত)

পাপ হয় না

একবার এক সন্ন্যাসী বসে বসে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অনেকে বসে আছে। তার মধ্যে দুজন চোরও ছিল। দুজনের একজন সন্ন্যাসীর একটা সোনার থালা চুরি করল। তা লক্ষ্য করে দ্বিতীয় চোর বলল, "ওরে এই, সন্ন্যাসীর সম্পত্তি চুরি করা পাপ!"

"সন্ন্যাসীই আমাকে দিলে পাপ হবে না তো?" প্রথম চোর জিজ্ঞেস করল।

উপদেশ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে সবাই চলে গেল। তারপর প্রথম চোর সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, "স্বামীজী, আমি এক অপরাধ করেছি, সোনার একটি থালা চুরি করেছি। কী হবে?"

"সেটা নিয়ে গিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে দাও। পাপ হবে না।" সন্ন্যাসী জবাবে বলল।

"আমি সে জিনিস আপনাকেই দিতে চাই, গ্রহণ করুন।" প্রথম চোর বলল।

"আমি চাই না। সেটা যার জিনিস তাকেই দিয়ে দাও।" সন্ন্যাসী বলল।

"উনি যদি না নেন তখন কী হবে?"

"তখন তুমিই রেখে দিতে পার। তাতে পাপ হয় না।" সন্ন্যাসী জবাবে বলল।

তৎক্ষণাৎ প্রথম চোর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে দ্বিতীয় চোরকে নিয়ে চলে গেল।

সত্য কর

সন্দেহ-বাতিক

এক শহরে সত্য সাহা নামে এক ব্যবসাদার ছিল। অন্যান্য ব্যবসার সাথে সে সুদের ব্যবসাও করত। তার অধীনে বড় কেরানীর কাজ করত চিত্তবাবু। ছোট কেরানীর কাজ করত নিত্যবাবু। ঘরের কাজকর্ম দেখা শোনার জন্য একজন চাকরও ছিল। এরা তিনজনই বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সত্য সাহা ঐ তিনজনের প্রত্যেককে সন্দেহ করত, কারণ সে ছিল সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোক।

সত্য সাহা ঐ তিনজনের প্রতি এমন কোন ব্যবহার করত না যাতে তারা তার মতলব ধরতে পারে। ওদের তিনজনের প্রত্যেকে ভাবত তাকেই সত্যবাবু বিশ্বাস করে।

একবার সত্যবাবুকে ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরের শহরে যেতে হোল। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে সে স্ত্রীকে বলল, "তুমি চাকরের উপর নজর রেখ। লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

সত্যবাবুর বউ বলল, "ঠিক আছে, নজর রাখবো।"

তারপর সত্যবাবু চাকরকে আলাদাভাবে ডেকে গোপনে বলল, "শোন, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বুঝলে?"

"আজ্ঞে, বলুন কী কাজ করতে হবে। আপনি যা বলবেন তাই করব।" চাকর বলল।

"না, তেমন কোন কাজ নয়। আমাদের ছোট কেরানী নিত্যকে জান তো, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না, ওর হাবভাব চালচলন ভাল নয়। আমি যতদিন না ফিরি তুমি ওর উপর নজর রেখ। তবে দেখো, তুমি যে ওর উপর

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

নজর রেখেছ তা যেন সে টের না পায়।" ব্যবসাদার বুঝিয়ে বলল।

"ঠিক আছে বাবু। আপনি যা বলেছেন তাই করব।" চাকর বলল।

তারপর ব্যবসাদার সত্যবাবু ছোট কেরানী নিত্যবাবুকে ডেকে গোপনে বলল, "নিত্য, তোমার উপর ভরসা রেখে আমি দূরের শহরে যাচ্ছি। আমাদের বড় কেরানী চিত্তর উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। তার উপর একটু নজর রেখো।"
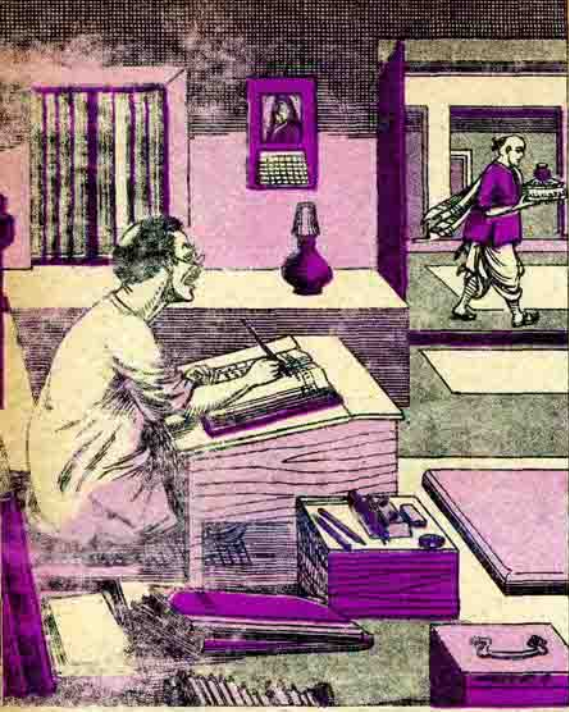
মালিক তাকে এত বিশ্বাস করে ভেবে নিত্যবাবু খুশীতে ডগমগ হয়ে বলল, "বাবু, আপনি একটুও ভাববেন না। আমি তার উপর হাজার চোখে নজর রাখব। ও কোন ক্রমেই আপনাকে ধোকা দিতে পারবে না।"

অবশেষে, ব্যবসাদার বড় কেরানী চিত্তবাবুর কাছে গিয়ে তাকে গোপনে বলল, "চিত্ত, আমি দূরের শহরে ব্যবসার কাজে যাচ্ছি। তোমাকে বিশেষ ভাবে আর কি বলব। এ দিকের ব্যবসা-পত্তর খুব সাবধানে দেখাশোনা করো। কোন কিছুই সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করো না।"

এই ভাবে ব্যবসায়ী সত্যবাবু সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দূরের শহরে চলে গেল। সবাই নিজের কাজ খুব সাবধানে করে যাচ্ছিল। দু-চার দিনের মধ্যেই বড় কেরানী চিত্তবাবু বুঝল যে নিত্যবাবু তার উপর নজর রেখেছে। আবার নিত্যবাবুও বুঝল যে তার উপর চাকর নজর রেখেছে। চাকরের মনে হল মালিকের স্ত্রী তার উপর বিশেষ নজর রেখেছে।

কিন্তু কেউ একথা ভাবতে পারল না যে এ-সব কিছু ব্যবসাদারের কারসাজি অনুসারেই হচ্ছে।

একদিন বড় কেরানী চিত্তবাবু কাউকে কোন কথা না বলে ছোট কেরানী নিত্যবাবুর নাকের ডগা দিয়ে বড় বড় থালায় করে চাল, ডাল এবং এক ঘটি ঘি নিয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে নিত্যবাবু আঁতকে

উঠল। মালিককে এই খবর দেওয়ার জন্য সে একটা কাগজে ঐ জিনিসের নাম সযত্নে লিখে রাখল। মালিককে তা দেখিয়ে চাকরিতে উন্নতি করবে এই তার আশা।

অন্য একদিন চাকরের চোখের সামনে ছোট কেরানী নিত্যবাবু, টাকার থলি নিজের পকেটে পুরে নিল। চোর ধরার আনন্দে মনে মনে নেচে উঠল চাকরটা। সে ঐ চুরির দিনক্ষণ সব মনে রাখল।

পরের দিন ঐ ব্যবসাদারের বাড়িতে এক তরিতরকারীর ফেরিওয়ালী এলো। চাকর হাতের কাজ ফেলে রেখে ঐ ফেরিওয়ালীর সাথে হেসে হেসে কথা বলতে লাগল।

এ-সব দেখে মালিকের বউ রেগে গিয়ে চাকরকে এক ধমক দিয়ে বলল, "তোর এত বড় স্পর্ধা, অ্যাঁ! তুই আমার সামনে এই ফেরিওয়ালীর সাথে হেসে হেসে কথা বলছিস। তোর সাহস তো কম নয়! বাবু আসুক, মজা দেখাচ্ছি!"

"আসুক না বাবু, আমি ভয় পাই নাকি!" চাকর বলল।

ব্যবসাদার সত্যবাবুর ফেরার পর তার বউ তার কাছে চাকরের বিরুদ্ধে গোপনে নালিশ করল। চাকর ছোট কেরানীর বিরুদ্ধে এবং ছোট কেরানী বড়
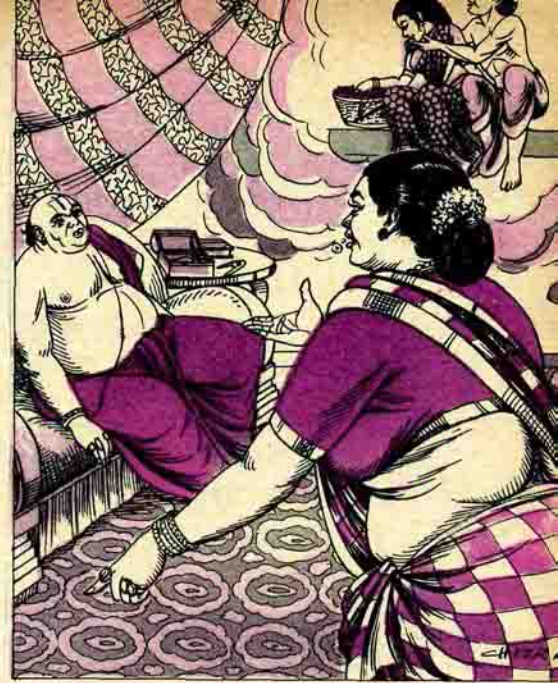
কেরানীর বিরুদ্ধে গোপনে নালিশ করল।

সবার নালিশ শোনার পর ব্যবসায়ী ওদের সবাইকে ডেকে বলল, "দেখ আমার না-থাকার সময় তোমরা তিন-জনে ন্যায় এবং ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আমার বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি করেছ। তোমাদের মত নিমক-হারামদের আমার বাড়িতে স্থান দেওয়া আমার মূর্খতা।"

বড় কেরানী চিত্তবাবু বলল, "আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলুন।"

"বলব আবার কি, তোমরা যে ধোকা-বাজী করেছ, আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। প্রমাণ দিলে তোমরা নিজের নিজের অপরাধ কি স্বীকার করবে?"

তারপর মালিক বড় কেরানীকে বলল, "থালায় করে চাল-ডাল আর ঘটিতে করে ঘি নিয়ে যাওনি ?"

এ কথার জবাবে চিত্তবাবু বলল, "সত্যবাবু, সেদিন ছিল শ্রাবণ মাসের শুক্রবার। সে দিনই লক্ষ্মীব্রতও ছিল। ঐ দিন চাল-ডাল-ঘি দেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাই নিয়ে গিয়ে দিয়েছি।"

ব্যবসাদার আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, "ওহো, ঠিক, ঠিক। কিন্তু আমি বলছি, এই নিত্যর কথা। অত টাকা থলিতে পুরে বেরিয়ে গেল।"

নিত্যবাবু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকার থলি পকেটে পুরেছি। কিন্তু সে টাকা আমার মাইনের। কত টাকা নিয়েছি তা খাতায় লিখেছি। দেখে নেবেন।"

ব্যবসাদার কেমন যেন আমতা-আমতা করে বলল, "তা ঠিক, তোমার মাইনের দিন এর মধ্যে পড়েছিল বটে। কিন্তু আমাকে যে নালিশ করেছে তার তো জানা উচিত কিসের টাকা নিয়ে গেলে! যাক কিছু মনে করো না!"

"তারপর, ব্যবসাদার চাকরের দিকে ঘুরে বলল "হ্যাঁরে, তুই যে কাজ ফেলে ফেরিওয়ালীর সাথে হেসে হেসে কথা বললি তার কারণ কি ?"

"বলেন কি বাবু, ঐ ফেরীওয়ালীতো আমার বউ। মা হয়তো এ কথা জানেন না, তাই আপনার কাছে তিলকে-তাল করে নালিশ করেছেন।"

এর ফলে ওরা তিনজনে পরিষ্কার বুঝল যে ওদের মালিকই ওদের মনে পরস্পরকে সন্দেহ করার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর ওরা তিনজনে একসাথে মালিককে বলল, "বাবু, আপনার মত সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোকের অধীনে কাজ করলে আমরা সত্যি সত্যি একদিন নিমক-হারাম হয়ে যাব। তাই আমরা আর আপনার কাছে চাকরি করতে চাই না। আমাদের পাওনা-গণ্ডা দয়া করে চুকিয়ে দিন।" এই কথা বলে ওরা তিনজনে একসাথে বেরিয়ে গেল।
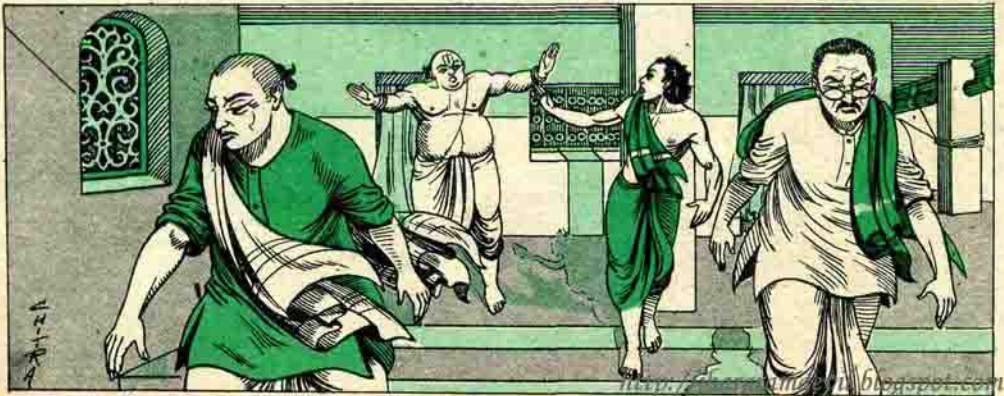
অপূর্ব কঙ্কন

অনেক দিন আগের কথা। কাশীতে রুই-দাস নামে এক মুচি ছিল। কবীরের গুরু রামানন্দই ঐ অচ্ছুত রুইদাসেরও গুরু ছিলেন। প্রাচীনকালের নাম-করা হিন্দি কবিদের মধ্যে রুইদাসও একজন।

রুইদাস জাতের পেশা অনুসারে জুতো সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন সকালে সে জুতো সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিল। কিন্তু কোন খদ্দের এলো না সেদিন।

সন্ধ্যা নাগাদ এক ব্রাহ্মণ নিজের ছেঁড়া জুতো রুইদাসের কাছে সারাতে রাখল। রুইদাস তাকে বলল, "বাবু আপনি কোন্ গ্রামের লোক?"

ব্রাহ্মণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, "আমি কাবেরী নদীর তীরের অধিবাসী। গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হতে এসেছি।"

এই কথা শুনে রুইদাস বলল, "বাবু, আপনার কাবেরী নদীতে কি জল নেই? আপনি শুধু স্নান করার জন্য এত দূর থেকে এত কষ্ট করে হেঁটে এসেছেন?"

ওর কথা শুনে ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বলল, "তুমি কি বলছ! গঙ্গার তীরে কাশীতে বাস করে তুমি এই ধরনের কথা বলছ? মনে হচ্ছে তুমি মা গঙ্গার মহিমার কোন খবর রাখ না। গঙ্গায় কোন দিন চান করেছ কি না শুনি?"

"বাবু, আমি আজ পর্যন্ত কোন দিন গঙ্গায় চান করিনি।" রুইদাস বলল।

রুইদাসের কথা শুনে তার উপর ব্রাহ্মণের করুণা জাগল। সে গঙ্গার মহিমার কাহিনী শুনিয়ে অবশেষে বলল, "তুমি যে গঙ্গায় স্নান কর নি এ তোমার দুর্ভাগ্য। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার জীবন বৃথা।"

এ-কথায় রুইদাস বলল, "মন যদি

জনমেজয় ভট্টাচার্য

পবিত্র হয়, ঘটির জলে গঙ্গা পায়।"

এই সব কথা বলতে বলতে রুইদাস জুতো সেলাইয়ের কাজ শেষ করে বলল, "বাবু, আপনি আমার একটা ছোট্ট উপকার করবেন?"

ব্রাহ্মণ জবাবে বলল, "আমার দ্বারা সম্ভব হলে কেন করব না।"

"আমার জীবনের চারভাগের তিনভাগ এখানেই কেটে গেছে। গঙ্গা-দর্শন আমার কপালে আছে কি না, আমি জানি না। তাই আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখতে বলছি। আপনি গঙ্গায় স্নান করার সময় আমার নামে এই সুপারি গঙ্গায় অর্পণ করে দিন।" রুইদাস থলি থেকে একটা সুপারি বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিল।

ব্রাহ্মণ সুপারি নিয়ে গঙ্গায় চলে গেল। তারপর গঙ্গায় চান করার সময় গঙ্গায় জল প্রবাহে ঐ সুপারি অর্পণ করতে করতে ব্রাহ্মণ বলল ঃ "হে মা গঙ্গা, রুইদাস তোমাকে এই ভেট দিয়েছে। গ্রহণ কর।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সুন্দর হাত জল থেকে জেগে উঠল। সেই হাতে নবরত্ন খচিত একটি কঙ্কণ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। "এই কঙ্কণ রুইদাসকে ভেট দাও।" কোত্থেকে যেন শব্দ ভেসে এলো।

ব্রাহ্মণ একেবারে থ বনে গেল। সে ঐ কঙ্কণ হাতে নিয়ে তীরে উঠে এলো। অনেকক্ষণ ভেবে সে মনে মনে নিজেকে যেন বলল, জুতো সেলাইকারী রুইদাস

কেমন করে জানবে যে তার সুপারির পরিবর্তে সে মা গঙ্গার কাছ থেকে নবরত্ন খচিত কঙ্কণ ভেট পেয়েছে! অতএব, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে এই কঙ্কণ ফেরত দেওয়া নিরেট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এটাকে বিক্রী করতে গেলে দোকানদার হয়তো আমাকে সন্দেহ করবে। ঝামেলা হতে পারে। তার চেয়ে এটাকে সোজা নিয়ে গিয়ে রাজাকে ভেট দিলে কাজের কাজ হবে। মা গঙ্গার কৃপায় হয়ত এইভাবে আমার দারিদ্র দূর হতে পারে।

কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে ব্রাহ্মণ সোজা কাশীর রাজার দরবারে গিয়ে, রাজাকে আশীর্বাদ করে ঐ কঙ্কণ ভেট দিল।

সেই নবরত্ন খচিত কঙ্কণ দেখে রাজদরবারের প্রত্যেকে আশ্চর্যান্বিত হল। রাজদরবারের জহরীরা পরীক্ষা করে বলল, "এতো দেবলোকের কঙ্কণ, মানবলোকের কঙ্কণতো এটা নয়!" তার ফলে রাজা দারুণ খুশী হয়ে ব্রাহ্মণ যা চাইবে তাই দান করবে ঠিক করে নিয়ে ঐ কঙ্কণ অন্তঃপুরে রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিল।

ঐ কঙ্কণ পেয়ে রাণীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। রাণী তৎক্ষণাৎ সেই কঙ্কণ বাঁ হাতে পরে নিয়ে সোজা রাজদরবারে গিয়ে রাণী ব্রাহ্মণকে বলল, "প্রিয়বর, এই একটা কঙ্কণে ভাল দেখাচ্ছে না। এর অন্য জোড় চাই।

এনে দিতেই হবে।"

রাণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে! কিছুক্ষণ ভেবে সে রাজার কাছে নিবেদন করে জানাল যে ঐ কঙ্কণের মত আর একটা কঙ্কণ জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব!

রাজা ব্রাহ্মণের কথা কানে না তুলে বলল, "আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই কঙ্কণের জোড়া যদি না আন তাহলে আমি ধরে নেব যে তুমি এই একটি কঙ্কণ চুরি করে এনেছ।"

ব্রাহ্মণ যেন মাটিতে বসে পড়ল। আসলে সে যা করল তা বলতে গেলে তো চুরি। চুরির শাস্তি মৃত্যু। অতঃপর ব্রাহ্মণ রাজাকে সন্ধ্যের মধ্যে ফেরার আশ্বাস দিয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে চলে গেল। ব্রাহ্মণ যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য রাজা তাকে অনুসরণ করতে কয়েকজন অনুচর পাঠাল।

তারপর ব্রাহ্মণ সোজা রুইদাসের কাছে গেল। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে বাঁচানোর প্রার্থনা করল।

রুইদাস চোখ বুজে গঙ্গার ধ্যান করে ব্রাহ্মণকে বাঁচানোর প্রার্থনা করল। তারপর চামড়া ভেজানোর পাত্রে হাত ডুবিয়ে আর একটা কঙ্কণ বের করল। সেখানে সমবেত সবাই এ-দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ রুইদাসের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কঙ্কণ নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে সেই কঙ্কণ তাকে সমর্পণ করল।

রুইদাস যেভাবে কঙ্কণ বের করে দিল তা শুনে কাশীরাজ অবাক হোল। সুখে রাখার সমস্ত ভার নিতে চেয়ে কাশীরাজ রুইদাসকে জুতো সেলাইয়ের কাজ ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু রুইদাস রাজী হল না।

এক দিনের রাজা

বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের অমলে বাগদাদের কথা। সেই কালে বাগদাদে এক অদ্ভুত ধরনের অবিবাহিত যুবক ছিল। নাম তার আবুল হোসেন। সে প্রত্যেকদিন নগরের নদীর সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। কোন নতুন লোককে শহরে ঢুকতে দেখলেই তাকে তার অতিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করত। অতিথি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আবুল হোসেন, ছেলে-বুড়ো, ধনী-গরীব বাছাই করত না, নিজের শহরের অথবা অন্য কোন শহরের লোক হোক, তা নিয়েও সে মাথা ঘামাত না। একটি রাত কাটানোর পরই, পরের দিন সকালেই সে ঐ অতিথিকে বিদায় করে দিত। সেই অতিথি অন্য কোন দিন ঐ সাঁকো দিয়ে শহরে ঢোকার সময় তার দিকে আবুল হোসেন এমন ভাবে তাকাতো যেন সে তাকে চিনতেই পারছে না। প্রতিবেশীদের কাছে আবুল হোসেনের এই ব্যবহার বড় বিচিত্র এবং অদ্ভুত ঠেকল।

একদিন সূর্যাস্তের সময় আবুল হোসেন সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে নতুন অতিথির অপেক্ষা করছে, এমন সময় মোসল শহরের এক ব্যবসাদার শহরে ঢুকতে গেলেন সাঁকো থেকে নেমে। তার সাথে ছিল এক লম্বা চওড়া গোলাম।

সেই ব্যবসাদার ছিলেন স্বয়ং হারুন-অল-রশীদ। ছদ্মবেশে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বাস্তব অবস্থা নিজের চোখে তিনি দেখে ফিরতেন। কিন্তু সে কথা আবুল হোসেন জানে না। সে যথারীতি সেই ব্যবসাদারের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সেলাম করে তাকে সেই রাতের জন্য তার ঘরে অতিথি হতে অনুরোধ করল, "আজ রাত্রে দয়াকরে আমার আতিথ্য

গ্রহণ করুন। কাল সকালেই আপনি বিদায় নিতে পারবেন।"

আবুল হোসেনের ব্যবহার বাদশাহের কাছে বিচিত্র লাগল। বাদশাহ ভাবল, এই ধরনের লোকের কাছ থেকে নতুন কোন অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। এই সব সাতপাঁচ ভেবে বাদশাহ আবুল হোসেনের আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজী হয়ে তার বাড়ি গেলেন।

হোসেনের মা নানান ধরনের রুচিকর সুস্বাদু খাবার রেঁধে খাওয়াল বাদশাহকে। দুজনে খাওয়ার পর গল্পগুজব করতে বসলেন। পান পাত্র হাতে তুলে নিলেন দুজনে। আবুল হোসেন অতিথিকে বলল, "আপনি আমাদের বাড়িতে আসায় আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।"

বাদশাহ বললেন, "আচ্ছা ভাই, এই ভাবে অচেনা অজানা লোককে অতিথি হতে বল কেন?"

আবুল জবাবে বলল, "আমার নাম আবুল হোসেন। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বাবা আমার জন্য অনেক বিষয়-সম্পত্তি জমিজায়গা রেখে গেছেন। বাবা আমাকে বাচ্চা বয়স থেকে সব সময় অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাবার মারা যাওয়ার পর আমার মনে সুখ ভোগের ইচ্ছা জাগল। তখন আমি একেবারে বোকার মত খরচ না করে, সমস্ত টাকা পয়সাকে দুভাগে ভাগ করে

দিলাম। অর্দ্ধেক অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পতি করে ফেললাম। আর বাকি অর্দ্ধেক অর্থ আমি একেবারে কোটিপতির মত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মনের আনন্দে খেয়ালখুশি মত খরচ করতে লাগলাম। সব সময় বন্ধুরা আমাকে ঘিরে থাকত। যে যা বলেছে, করেছি। সে কি আনন্দ! কিন্তু এক বছর পূর্ণ হতেই আমার হাতে কানাকড়িও রইল না। তখন আর কি করি, আমার সেই বন্ধুদের কাছে হাত পাতলাম। কিন্তু কী বলব কেউ এক পয়সা দিল না। আমার অবস্থা জনে জনে ধরে ধরে বললাম কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। এ-কথা ও-কথা বলে প্রত্যেকে এড়িয়ে গেল। এমনকি আমাকে কেউ একদিন ডেকে খাওয়াল না! ভীষণ দুঃখ হল। বাড়িতে বসে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোন দিন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঘুরব না এবং একমাত্র অপরিচিত লোককেই অতিথি হিসেবে বরণ করব। আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি বহু দিনের বন্ধুত্বের চেয়ে অল্প সময়ের প্রীতির সম্পর্ক অনেক বেশি মধুর। আর একটি প্রতিজ্ঞা করলাম, অপরিচিত অতিথিকেও একদিনের বেশি রাখব না। কাল সকালে আপনাকে বিদায় দিলে, আশাকরি, কিছু মনে করবেন না। কারণ আমাদের মধুর সম্পর্ক আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে।"

আবুল হোসেনের কথা শুনে বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদ বললেন, "তোমার

ব্যবহার আমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকলেও এখন তুমি যা করছ সত্যি ভাল। ভাগ্যিস অর্দ্ধেক অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি করে রেখে ছিলে। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। তুমি আমাকে এত গভীর আন্তরিকতার সাথে আতিথ্যে বরণ করলে, ভাবছি কেমন করে এই ঋণ শোধ করব। আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। তোমার কোন ইচ্ছা যদি অপূর্ণ থাকে আমাকে বলতে পার। আমি সাধারণ ব্যবসাদার হলেও তোমার যে-কোন ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখি।"

একথা শুনে আবুল হোসেন কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, "আপনার সাথে পরিচিত হয়েই আমি খুশী। আমার অপূর্ণ কোন ইচ্ছা নেই।"

"তোমার না থাক আমার তো থাকতে পারে। আমাকে এভাবে এড়িয়ে গেলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব। আমার মনে হবে, আমি ঋণের বোঝা বইছি। উপ-কারীকে দ্বিগুণ প্রতি-উপকার করা মানুষের কর্তব্য।" বাদশাহ বললেন।

অতিথির দরদী মনের পরিচয় পেয়ে আবুল হোসেন একটু ভেবে বললেন, "কোন অপূর্ণ ইচ্ছাই যে আমার মনে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন।"

"কোন্ ইচ্ছা না জেনে পাগল বলি কি করে! আমি সাধারণ এক ব্যবসাদার বটে, কিন্তু আমি তো বলেছি আমি যে কোন ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা রাখি। তাই বলছি, কোন রকম সঙ্কোচ না করে তোমার ইচ্ছার কথা আমাকে বল।" বাদশাহ বললেন।

"আপনি জিজ্ঞেস করছেন, তাই বলছি। তবে আমার ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা একমাত্র বাদশাহেরই আছে। আমার একটি মাত্র ইচ্ছা, মাত্র একদিনের জন্য আমি যেন হারুন-অল-রশীদের রাজ-সিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে পারি।"

আবুল হোসেন বলল। বাদশাহ মুহূর্ত-কাল ভেবে বললেন, "তুমি একদিনের জন্য রাজা হয়ে কী করতে চাও ?"

"মশাই, এই বাগদাদ চারভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক ভাগে একজন করে অধিকারী আছে। আমাদের ভাগের অধিকারীটি অত্যন্ত খারাপ লোক। নীচ প্রকৃতির। আর এই জঘন্য লোকটির সাথে দুজন সাঁকরেদ রয়েছে। একজন ঘোড়া মুখো আর অন্যজন টেকো। বহু পাপ কাজ এরা করেছে। অনেক সৎ লোককে এরা পথে বসিয়েছে। কত লোকের সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। অন্যায় ভাবে, বিনা বিচারে বহু লোককে বধ করেছে। আমি একদিনের জন্য রাজা হতে পারলে, আমি নিজের জন্য একটি পয়সাও নেব না ; আমার বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়স্বজনকে এক পয়সাও দেব না। শুধু ঐ তিনজনকে চরম শাস্তি দেব।" আবুল হোসেন বললেন।

"সত্যি তোমার ইচ্ছা প্রশংসার যোগ্য। তোমার ইচ্ছা পূরণ হতেও পারে। কারণ, আমাদের বাদশাহ দারুণ কৌতূহলী মানুষ। বাদশাহকে জানালে উনি তোমাকে একদিনের রাজা করতেও পারেন।" বললেন বাদশাহ।

আবুল হোসেন এ-কথা শুনে একগাল হেসে বলল, "এমনি সময় কাটানোর জন্য আবোল-তাবোল বকছি। আমার ইচ্ছার কথা কোন রকমে বাদশাহের
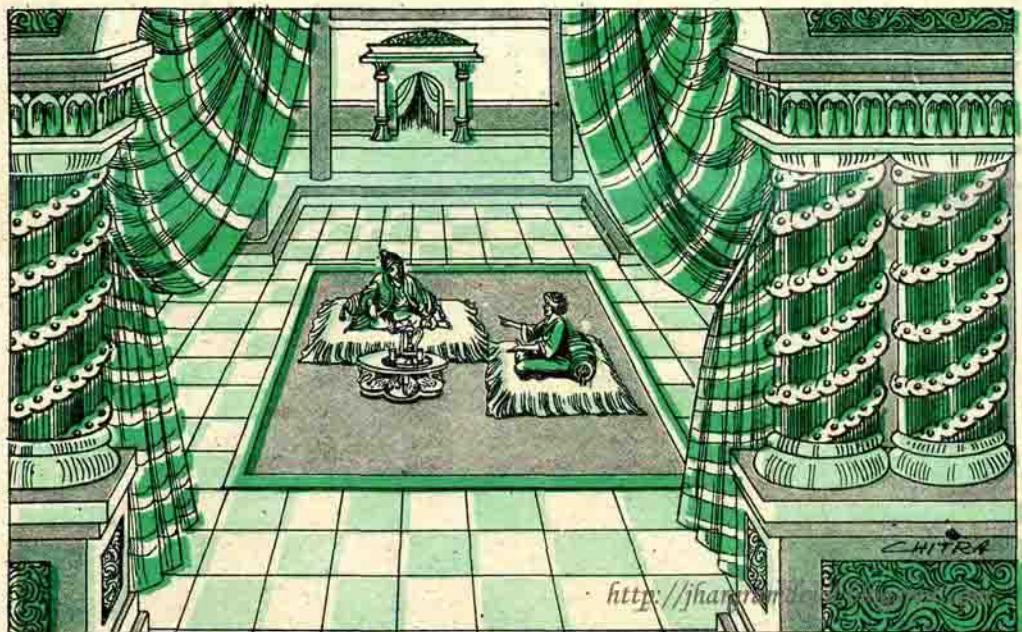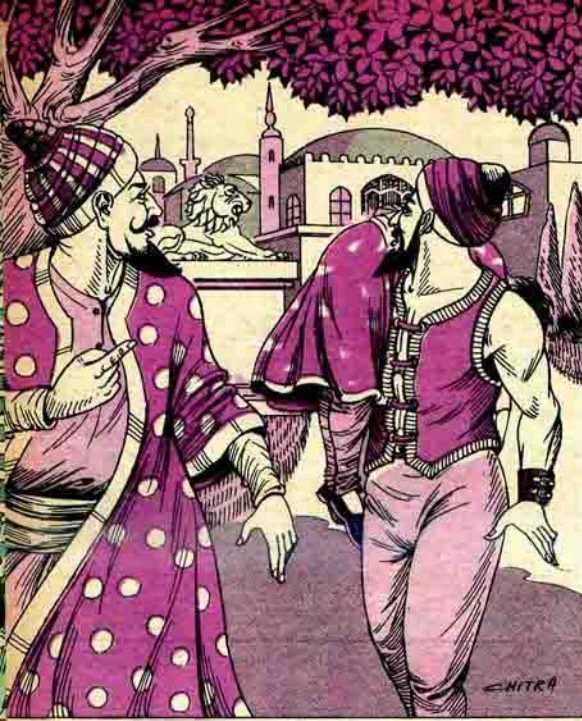
কানে গেলে আমাকে একেবারে পাগলা গারদে পুরে দেবে। তাই বলছি, বাদশাহের লোকজনের সাথে আপনার যদি চেনা-শোনা থাকে তো ভুলেও তাদের কাছে এসব কথা বলবেন না"

"আমি শপথ করে বলছি, তোমার ইচ্ছার কথা আমি কাউকে বলব না।" বাদশাহ বললেন। বললেন বটে কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন আবুল হোসেনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। বহুবার বাদশাহ নানান পোষাকে রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু এই ধরনের ইচ্ছার কথা তিনি কোন দিন শোনেননি।

তারপর বাদশাহ আবুল হোসেনের হাত থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে বললেন, "এবার গেলাসে আমি ঢালছি।" পান-পাত্রে সরাব ঢালতে ঢালতে এক ফাঁকে, আবুল হোসেনের চোখের আড়ালে, বাদশাহ কী এক নেশার ওষুধ সরাবে মিশিয়ে দিলেন।

আবুল হোসেন অতিথির হাত থেকে সরাব ভর্তি গেলাস হাতে তুলে বলল, "আমি এখনই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, সকালে আপনার যাওয়ার সময় হয়ত আমার ঘুম ভাঙবে না। আপনি দয়া-করে, যাওয়ার সময়, দরজা বন্ধ করে যেতে ভুলবেন না।"

বাদশাহ রাজী হওয়ার পর সরাবের পাত্র উজাড় করে আবুল হোসেন বিছানায় শুয়ে পড়ল। সেইভাবে তার শুয়ে পড়া দেখে বাদশাহের হাসি পেল।

তারপর বাদশাহ নিজের গোলামকে ডেকে বললেন, "তুমি এই লোকটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আমার সাথে চল। এই বাড়িটা চিনে রাখ। প্রয়োজন হলে আবার তোমাকে এ-বাড়িতে পাঠাতে পারি।"

ওরা দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে বাদশাহ ভুলে গেলেন। গোপন পথে রাজপ্রাসাদের বাদশাহের শোয়ার ঘরে পৌঁছালেন।

"এই লোকটার সমস্ত পোষাক খুলে, রাত্রে আমি যে পোষাক পরে থাকি সেই পোষাক পরিয়ে একে আমার বিছানায় শুইয়ে দাও।" বাদশাহ আদেশ দিল। তারপর বাদশাহ রাজপ্রাসাদের কর্মচারী, উজীর, পাহারাদার এবং অন্তঃপুরের মহিলাদের ডেকে পাঠালেন।

সবার আসার পর বাদশাহ বলল, "কাল সকালে তোমরা সবাই এই ঘরে চলে আসবে। এই লোকটি যা বলবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তোমরা আমার সাথে যে ধরণের ব্যবহার করে থাক এই লোকটির সাথেও ঠিক সেই ধরণের ব্যবহার করবে। এর কোন ইচ্ছা, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, তোমরা পালন করবে! যে তা পালন করবে না, সে আমার ছেলে হলেও নিস্তার নেই। তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে।" তারপর, সবাই বাদশাহের কাছে অনুমতি নিয়ে একে একে চলে গেল। বাকি রইল উজীর জফর এবং বেত্রহস্ত মনশূর।

বাদশাহ ওদের বললেন, "তোমরা দুজনে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে আসবে। এ যাই বলুক না কেন, কোন রকম ইতঃস্তত কর না। এমন কি এ যদি বলে যে সে বাদশাহ নয় তবু তোমরা এমন অভিনয় করবে যেন তোমরা একমাত্র তাকেই বাদশাহ হিসেবে জান, অন্য কাউকে নয়। এ যাকে যা দান করতে বলবে তাকে তাই দান করবে। খাজানা খালি হয়ে গেলেও সঙ্কোচ করার কিছু নেই। এর আদেশ অনুসারেই শাস্তি, পুরস্কার, ফাঁসি, চাকরি প্রভৃতি দেবে। এর নির্দেশে চাকরিও খাবে। একটি কথা, এ সব কিছু আমার ইচ্ছা পূরণের জন্যই যে তোমরা করছ তা যেন এ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তোমরা ঘুম থেকে উঠে আমাকেও ডেকে তুলে দিও।" (চলবে)
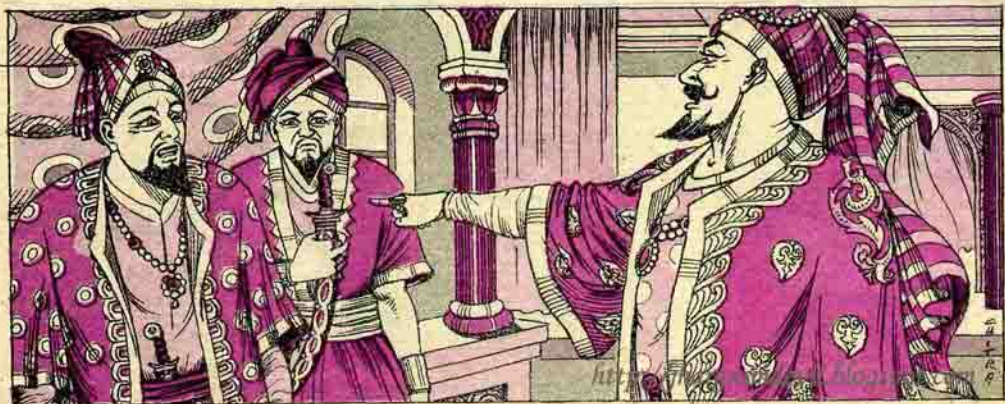
ব্রহ্মচারী ও বাঁদর

কৃষ্ণা নদীর তীরে ভেলা নিয়ে এক মাঝি ছিল। একদিন সেই ভেলায় এক ঝাঁটা ফেরিওয়ালী, এক বাঁদর খেলানোর লোক এবং এক সাপুড়ে উঠে বসল।

ভেলা এগোতে শুরু করতেই দূর থেকে এক ব্রহ্মচারী হাঁক দিল, "থামাও, ওমাঝি, থামাও!"

ভেলার উপর যারা বসে ছিল তারা মাঝিকে বলল, "ব্রহ্মচারীকে ভেলায় বসতে দিয়ো না। তীরে যেয়ো না। থামিয়ো না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।" কিন্তু মাঝি ব্রহ্মচারীকে ভেলায় বসাল।

ভেলা যখন মাঝ-দরিয়ায় পৌঁছাল তখন ব্রহ্মচারী একটা ঝাঁটার কাঠি বের করে বাঁদরের কানে খোঁচা দিল। বাঁদর লাফিয়ে উঠে সাপুড়ের টুকরিতে লাথি মারল। সেই টুকরি থেকে জাত-সাপ বেরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সাপদের ভয়ে সেই ঝাঁটা ফেরিওয়ালী ও ব্রহ্মচারী জলে ঝাঁপ দিল; তাদের বাঁচাতে গিয়ে মাঝির বিপদের একশেষ। তখন সেই মাঝি ভাবল, একজন ব্রহ্মচারী একশোটি বাঁদরের সমান।

—নাগেশ্বরানন্দ
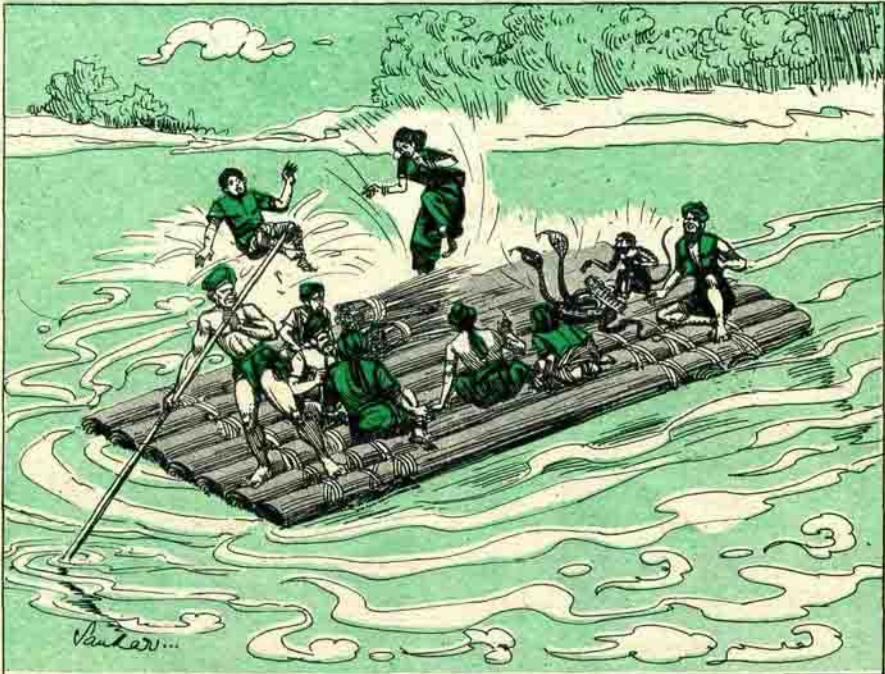
যার কাজ তারে সাজে

এক গ্রামে গুরুদাস নামে এক কিষাণ ছিল। সে ক্ষেতখামারের কাজের পর অবসর সময় ব্যবসাও করত। গুরু-দাসের রামনাথ এবং শঙ্করদাস নামে দুই ছেলে ছিল। রামনাথ বাবাকে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করত। ছোট ছেলে শঙ্কর দাস দোকানের কাজ কর্ম দেখত। ছেলেরা বড় হলে গুরুদাস ওদের বিয়ে দিল। রামনাথের বউ এবং শঙ্করদাসের বউএর মধ্যে ঝগড়া বেধে যেত।

একদিন রামনাথের স্ত্রী শঙ্করদাসের স্ত্রীকে বলল, "আমার কর্তা সাত সকালে উঠে ক্ষেতে গিয়ে রোদে বৃষ্টিতে ফসল ফলায়। তাতেইতো বাড়ির সবাই খেতে পায়। আর তোমার কর্তা আরামে দোকানে বসে থাকে। বসে থাকার কাজ যে কোন লোক করতে পারে।"

নিজের স্বামীর ব্যাপারে এ রকম উপেক্ষার মনোভাব দেখে ছোট বউ সহ্য করতে না পেরে রেগে গিয়ে বলে উঠল, "দোকানের কাজে বুদ্ধি খরচ করতে হয়। বুঝলে! তাই বলদের মত ক্ষেতের কাজ করেন।"

সেই দিন রাত্রে দুই বউ নিজের নিজের স্বামীকে যা ঘটল তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তিলকে-তাল করে বলল। শুনে দুই ভাইয়ের পৌরুষ জেগে উঠল।

পরের দিন রামনাথ শঙ্করদাসকে বলল, "হ্যাঁরে, শুনলাম, কাল বউমা আমার কাজ সম্পর্কে ঠাট্টা করেছে। বউমাকে বকে দিসতো।"

"আমি শুনলাম, তোমার বউমা তেমন কিছুই বলেনি, বউদিই না কি যা মুখে এসেছে তাই বলেছে।" ছোট ভাই শঙ্কর-দাস বলল।

"তোমার বউদি যা সত্য তাই

জয়ন্ত কুমার দত্ত

বলেছে।" রামনাথ নিজের স্ত্রীকে সমর্থন করল।

শঙ্করদাসও নিজের স্ত্রীকে সমর্থন করল। কথার পিঠে কথা উঠল।

ছেলেদের এভাবে ঝগড়া করতে দেখে গুরুদাস ওদের কাছে ডেকে বলল, "বাপ্‌ধনেরা, ঝগড়া করছিস কেন ?"

"বাবা, আপনিতো ছোট ভাইকে আদরে আরামে দোকানে বসার কাজ দিয়েছেন, আর আমাকে ক্ষেতে এত কাজ করতে হয় যে খাটতে খাটতে জীব বেরিয়ে যায়। আমি আর ক্ষেতের কাজ করতে পারবো না।" রামনাথ বলল।

"শঙ্করদাস, এবার তোমার কথা বল।" গুরুদাস ছোট ছেলেকে বলল।

"দাদাকে বছরে মাত্র চার মাস ক্ষেতের কাজ করতে হয় আর আমাকে সারা বছর দোকানের কাজ দেখতে হয়। আমার আর এ কাজ করতে ইচ্ছে করছে না।" শঙ্করদাস বলল।

গুরুদাস কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "রাম-নাথ আজ থেকে তুমি ক্ষেতের কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকানের কাজ দেখ, আর শঙ্কর তুমি ক্ষেতের কাজ কর।"

রামনাথ দোকানে বসল। কিন্তু কিছু হিসেব জানেনা বলে সে কাজে মেজাজ পাচ্ছিল না। শঙ্করদাস ক্ষেতে তো গেল কিন্তু কিছুক্ষণ কাজ করতেই ক্লান্ত হয়ে গেল। সারাদিন কোন রকমে সামলে উঠে সন্ধ্যায় তাদের দুজনের মনে হল তারা যেন সারাদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই শঙ্করদাস বাবাকে বলল, "বাবা কাল থেকে আমি দোকানের কাজই দেখা শোনা করব।" ঠিক একই ভাবে রামনাথও ক্ষেতের কাজই করতে চাইল।

সেই রাত্রে দুই বউ নিজের নিজের স্বামীকে বলল, "ছি, ছি! আবার সেই এক ঘেয়ে কাজ করতে চাইলে!"

কিন্তু এবার আর স্ত্রীর কথায় কেউ কান দিল না। উপরন্তু তাদের বকল। পরের দিন থেকে যার কাজ সে করতে লাগল।

বল প্রদর্শন

চৌথ নামক এক টিলার কাছের গ্রামে এক পালোয়ান এসেছিল। সে ঐ গ্রামে নিজের বল প্রদর্শন করার জন্য এক বিরাট পাথর তুলে গ্রামবাসীদের অবাক করে দিয়েছিল।

গ্রামবাসীরা সবাই যখন সেই পালোয়ানকে প্রশংসা করছিল তখন একজন বলে উঠল, "আপনারা এই লোকটাকে এতো প্রশংসা করছেন কেন ? এতো মাছ, মাংস খেয়ে, দুধ পান করে মোটা হয়ে পাথর তুলছে ! আমাকেও ছ মাস মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাওয়ালে আমিও ঐ পাথরের চারগুণ বড় পাথর বহন করতে পারব।"

গ্রামের লোক তার কথায় বিশ্বাস করে ছ মাস ধরে পালা করে তাকে খাওয়ালো। তারপর, সবাই তাকে বলল, "আচ্ছা এবার দেখাও তোমার বল। ঐ বড় পাথরটা তোল !"

"আমি পাথর তোলার কথা তো বলিনি, বহন করার কথা বলেছি। আপনারা ঐ পাথরটাকে তুলে আমার কাঁধে রাখুন, আমি বহন করতে না পারলে, তখন বলবেন।" ধূর্ত লোকটা জবাবে বলল।

—জীবন সাঁই
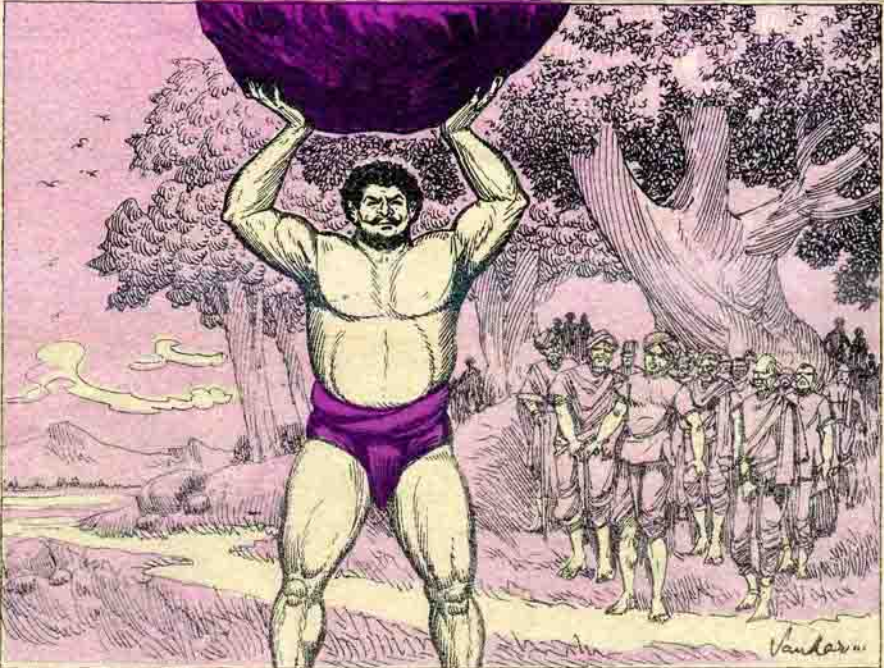
ন্যায়-যুদ্ধ

এক গ্রামে জগদীশ নামে এক ধনী লোক ছিল। সে ছিল সুদের কারবারী। সোনার গহনা বন্ধক না রেখে সে কাউকে ধার দিত না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ না করলে সে ঐ সোনার গহনা ফেরত দিত না। ফলে ঐ গহনা তার স্ত্রীর গায়ে উঠত।

সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থের হঠাৎ অনেক টাকার দরকার হয়। সে জগদীশের কাছে হীরের হার বন্ধক রেখে দু হাজার টাকা ধার নেয়। কিন্তু ধার শোধ করার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হঠাৎ লোকটা মারা গেল। তার জোয়ান ছেলে সুদ সহ আসল সতর-আঠারশো টাকা শোধ করল। কঠিন পরিশ্রম করে, আরও রোজগার করে, যুবক জগদীশকে তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে হীরের হার ফেরত নিতে চাইল।

"সময় পেরিয়ে গেছে। আমি ঐ হার কোন ক্রমেই ফেরত দিতে পারব না।" জগদীশ বলল।

দু হাজার টাকার দামী হার হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে যুবকের মনে ভীষণ রাগ হোল। সে গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে নালিশ করল। কিন্তু সব কথা শুনে মোড়ল বলল, "আমি কি করতে পারি? তোমার বাবা যে-ভাবে লেখাপড়া করে গেছেন সেই ভাবেই কাজ হয়েছে। জগদীশের ঘরে সিঁধ না কেটে বোধ হয় তোমার ঐ হার ফেরত পাওয়ার আর কোন উপায় নেই।"

মোড়ল হেসে হেসে বললেও কথাটা যুবকের কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে সোজা মনে গেঁথে গেল। সুযোগের অপেক্ষায় যুবক ওত পেতে জগদীশের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল।

এন্. আর. আচার্য

একদিন সকালে জগদীশের সুদের তাগাদা দিতে বেরুনোর মুখে তার স্ত্রী জোরে জোরে বলল, "হ্যাঁগা, হীরের হারের একটা হীরা ঢিলে হয়ে গেছে। যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে। ওটাকে ভাল করে বসাতে সেকরাকে দিয়ে এসো না।"

"চরণদাস সেকরাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে জগদীশ বেরিয়ে গেল।

এই কথা ঐ যুবক আড়ি পেতে শুনল। যুবকটি বাড়ি গিয়ে তার এক বিশ্বাসী বন্ধুকে ডেকে সমস্ত ব্যাপার গোপনে বলে দু ঘন্টা পরে তাকে সুদখোর জগদীশের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

যুবকের বন্ধু সোজা জগদীশের বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়ল। জগদীশের স্ত্রী দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? কি ব্যাপার?"

"আমিতো আপনাদের চরণদাস সেকরা, বাবু পাঠিয়েছেন। হীরের হারের একটা হীরে নাকি নড়ছে, বসাতে হবে?" আগন্তুক বলল।

"হ্যাঁ। এত দেরী করলে কেন? বাবু তোমাকে এখন পাঠালেন?" জগদীশের স্ত্রী বলল। "আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবু তাড়াতাড়ি সারিয়ে দিতে বললেন। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে সারিয়ে আনছি।" বলে লোকটা হীরের হার নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ হার গৃহস্থের ছেলের হাতে পেঁাছে গেল।

সন্ধ্যার সময় জগদীশের বাড়ি ফেরার
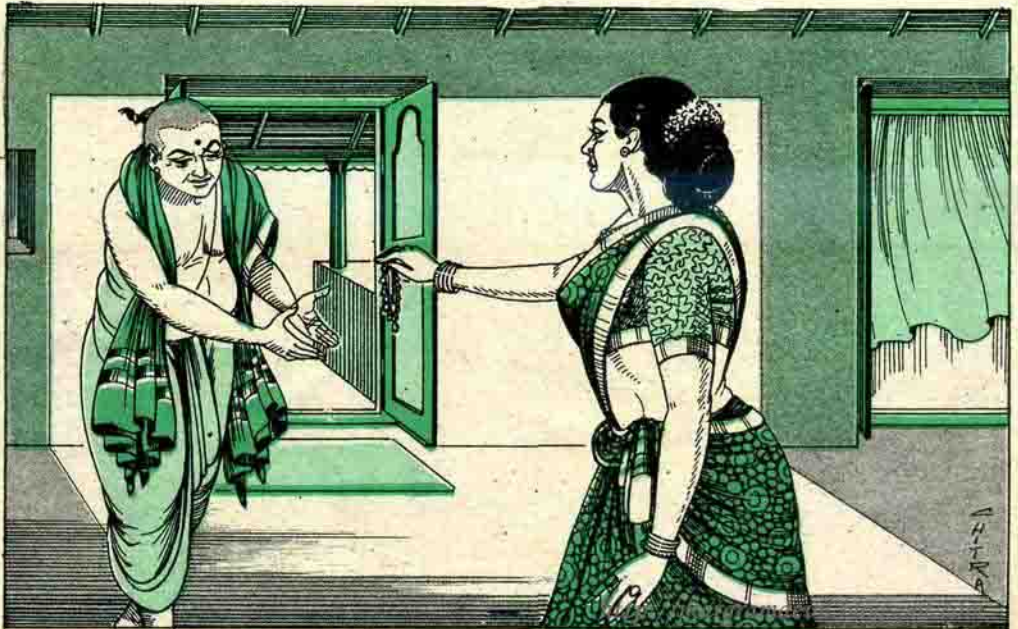
পর তার স্ত্রী বলল, "আচ্ছা-লোককে হার সারাতে বললে! আধ ঘন্টায় সারিয়ে দেব বলে এখনও তার পাত্তা নেই!"

"হীরের হার! ও-হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। এখন মনে পড়ছে। আরে, তাগাদার ঝামেলায় পড়ে আমি চরণদাসকে বলতেই ভুলে গেছি। তা তুমি কার কথা বলছ?" জগদীশ অবাক হয়ে বলল।

তারপর যখন স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনল তখন তার মনে হোল পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

জগদীশ পরিষ্কার বুঝতে পারল, এ নিশ্চয় কোন ধোকাবাজের কাজ।

জগদীশ তাড়াতাড়ি মোড়লের কাছে গিয়ে ঐ হার চুরি যাওয়ার খবর দিয়ে বলল, "আপনি দয়া করে এক্ষুনি ঢাক পিটিয়ে দিন। যে আমার ঐ হার ফেরত দেবে অথবা ফেরত পাইয়ে দেবে তাকে আমি চারশো টাকা পুরস্কার দেব।"

"জগদীশ বাবু, ধারের টাকার মধ্যে সুদ সমেত চার-পাঁচশো টাকা ঠিক সময়ের মধ্যে দিতে পারে নি বলে আপনি কিছুতেই সেই হার ফেরত দিলেন না। এখন ঢাক পিটিয়ে চার-পাঁচশো টাকার কথা বললে লোকে কি বলবে? হার চুরি গেছে এতে আপনার আর কি ক্ষতি হয়েছে। যার হার গেল তার অনেক আগেই গেল।" মোড়ল বলল।

মোড়লের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে জগদীশ বাড়ি ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থের ছেলে জগদীশের কাছে গিয়ে বলল, "জগদীশবাবু, এই নিন আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা। হারের চোর আমার হাতে ধরা পড়েছে। আমার হার আমি ফেরত পেয়েছি। আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি যে আমার হার আমি ফেরত পেলাম। নিন টাকা, আপনিও লিখে দিন টাকা বুঝে পেয়েছেন"

নিরুপায় হয়ে জগদীশ সেই যুবককে পুরো টাকা বুঝে পাওয়ার রসিদ লিখে দিল এবং যুবকও রসিদ লিখে দিল হার ফেরত পাওয়ার।
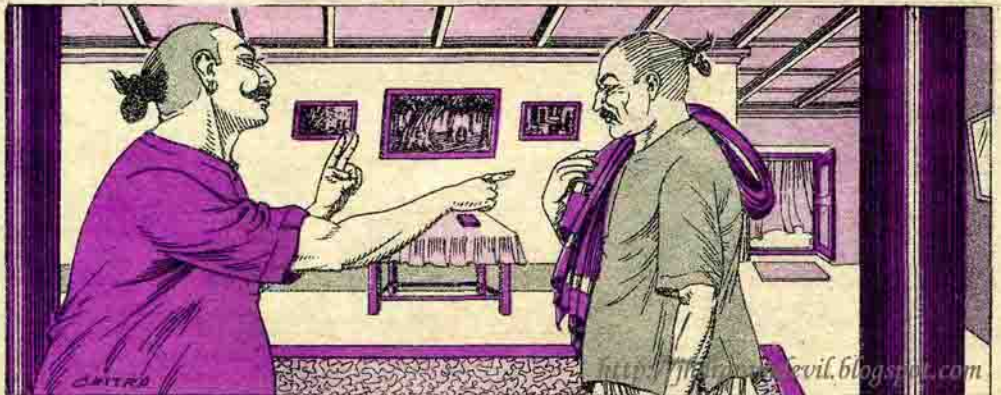
স্বভাব

এক গ্রামে এক ছিল ধোকাবাজ। সে সব সময় অন্যদের কাছ থেকে ধার নিয়ে ঠেসে খেত। যে একবার ওর খপ্পরে পড়ত সে আর কোন দিন ওর কথায় বিশ্বাস করত না। কিন্তু নতুন লোকে ওর কথায় বিশ্বাস করে ধার দিয়ে বসত। এইভাবে সে যখন গ্রামের সবাইকে ধোকা দিল তখন সবাই মিলে রাজার কাছে নালিশ করল।

রাজা সবার কথা শুনে মনে মনে ঠিক করলেন, ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। অনুচরদের আদেশ দিলেন, "তোমরা ওকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে তার পিঠে ভারী পাথর বসিয়ে দাও।" রাজার নির্দেশ অনুচররা পালন করল।

সেই সময় একজন ব্যবসায়ী হাতী বিক্রী করতে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পাথর বহনকারী ব্যবসাদারকে জিজ্ঞেস করল, "এই হাতী কি বিক্রীর জন্য?"

ব্যবসাদার বলল, "নিশ্চয়। বিক্রী করার জন্যই তো এতগুলো হাতী এনেছি।"

"তাহলে, এক কাজ কর, দুটো হাতী ধারে দিয়ে যাও।" পাথর বহনকারী বলল।

এই কথা শুনে, রাজা অনুচরদের বললেন, "ধার করাওর স্বভাব। ওকে যে ধরনের শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, ও শোধরাবে না। অতএব, ওকে ছেড়েই দাও।"

—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

গণপতি ভট্ট

একগ্রামে গণপতি ভট্ট নামে এক ভাট ছিল। ভাটের কাজ ছিল ধনীদের তোষা-মোদ করে, গুণগান করে উপহার সংগ্রহ করা। তাতেই সে পেট চালাত। এই পেশায় সে ছিল নিপুণ। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সে সবার মন জয় করতে পারত।

সেই গ্রামে এক ছিল জমিদার। জমিদার-বাড়িতে যে কোন কাজ হলে সে হাজির হোত এবং তাদের বংশের গুণ-গান করে কবিতা রচনা করে পাঠ করত। কিন্তু সেই জমিদার ছিল হাড় কিপটে। তাই সে সামান্য কিছু গণপতির হাতে গুঁজে দিয়ে ভবিষ্যতের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাকিটা পুষিয়ে দেওয়ার কথা বলত।

জমিদারের মুখে এক কথা বার বার শুনে গণপতি মনে মনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল বটে কিন্তু সে সাতপাঁচ ভেবে ঐ জমিদারকে ছেড়ে অন্য কোন জমিদারের কাছে গেল না।

তার মনের কোণে আশা ছিল একদিন-না-একদিন ঐ জমিদারের কাছ থেকে সে ভাল কিছু উপহার পাবে। এই আশাতেই সে ঐ গ্রামেই রয়ে গেল।

ভাটের মনে জমিদারের কাছ থেকে এক দুধালো মোষ আদায় করার ইচ্ছে ছিল। ভাটের বাড়ির লোক দুধ এবং দই খাওয়ার আশায় দিন গুণ ছিল।

ঠিক সেই সময়ে জমিদারের বড় ছেলের বিয়ের ঠিক হোল। বিয়ে দারুণ খরচা করে ধুমধামসে করা হোল। দূর দূর থেকে বহু গণ্যমান্য এবং ধনী ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এসে ছিল সেই অনুষ্ঠানে। গণপতিও যথারীতি হাজির হোল সেই অনুষ্ঠানে। বর-বধূকে

প্রীতম গুহ

আশীর্বাদ করে সে কয়েকটি চমৎকার কবিতা রচনা করে পাঠ করে শোনাল। সেই কবিতাবলী জমিদারের গুণকীর্তন আর যশগাথায় ভরা ছিল। উপস্থিত সবাই সেই কবিতাবলী শুনে ভাটকে খুব প্রশংসা করল।

জমিদার ভাবল, এইবার ভাটকে একটা ভাল কিছু উপহার দিতেই হবে। সে গণপতি ভট্টকে জিজ্ঞেস করল, "একটা ভাল কিছু দেব ভাবছি। কি দেব, টাকা না জিনিস ?"

"আমাকে দয়া করে একটা দুধালো মোষ দিলে খুব ভাল হয়।" গণপতি ভট্ট জবাবে বলল।

"ঠিক আছে, তাই দেব।" এই কথা বলে জমিদার চাকরকে ডেকে তার কানে কি যেন বলল। চাকর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে এক মোষ এনে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখল।

সেই মোষ দেখে গণপতি ভট্ট হতাশ হোল। এক বুড়ী মোষ। কোনদিন তার বাচ্চা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অতএব, তার কাছ থেকে দুধ পাওয়ারও আশা নেই। উল্টে তাকে দুবেলা খাওয়াতেই তাকে ফতুর হতে হবে।

কিন্তু গণপতি ভট্ট অত লোকের মধ্যে সে-কথা জমিদারকে মুখ ফুটে বলে কি করে। তাই, সে ভাবতে লাগল কেমন করে বলবে। কিছুতেই সেই মোষ নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। সাতপাঁচ, ভেবে, সোজা

মোষের কাছে গিয়ে ভাট তার কানে কানে কিছু বলার এবং মোষের মুখের কাছে কান রেখে কিছু শোনার অভিনয় করল। ভাটের ঐ ধরণের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই বিস্মিত হোল।

"গণপতি ভট্ট, কি করছ তুমি ?" জমিদার জিজ্ঞেস করল।

গণপতি সবিনয়ে, হাত জোড় করে জমিদারকে বলল, "আজ্ঞে, আমি মোষটাকে একটা প্রশ্ন করেছি। মোষ আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।"

"তুমি মোষকে কি প্রশ্ন করেছ ? আর মোষ তোমাকে কি জবাব দিয়েছে ?" জমিদার ভট্টকে প্রশ্ন করল।

ভট্ট জবাবে বলল, "আজ্ঞে, আমি মোষটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি বাচ্চা দেবে ? তোমার দুধ পাব কোন দিন ? মোষ আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'সে যুগে আমি মহিষাসুরের পত্নী ছিলাম। আদি শক্তি আমার পতিকে বধ করে ছিলেন। কিন্তু আমার মরণ হোল না। তারপর, ত্রেতা যুগ এলো। মানুষ সব বদলে গেল। পশুপাখিও বদলে গেল। কিন্তু আমি বদলাই নি। আমি চোখের সামনে দেখেছি রাবণের জন্ম ও মৃত্যু। আমি এই পোড়া চোখে অনেক কিছু দেখেছি। দুনিয়ার উপর বিরক্তি জেগেছিল। এখন কলিযুগের পালা। এখন আমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। আমার এই অবস্থায় তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমার বাচ্চা হবে কি না ? আমাকে এই প্রশ্ন করতে তোমার লজ্জা করল না ?' এই জবাবটাই মোষ আমাকে দিল, বাবু।"

ভট্টের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সবাই বুঝতে পারল জমিদার গণপতিকে কী ধরণের মোষ দিয়েছে। জমিদারও ভাবল তক্ষুণি একটা ব্যবস্থা না করলে তার মান-সম্মান কিছুই আর থাকবে না। সে তৎক্ষণাৎ ঐ চাকরকে ধমক দিয়ে ভাল দুধালো মোষ আনিয়ে গণপতি ভট্টকে উপহার দিল।

সভাস্থলে ভীষ্মও কৃপাচার্য দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন। তারপর, ত্রিগর্তরাজ, কৌরব রাজ্যের রথ-সেনার নেতা, সুশর্মা উঠে বললেন, "মৎসদেশের রাজা অনেক বার আমার দেশের উপর আক্রমণ করেছে। তার অত্যন্ত শক্তিশালী বলবান সেনাপতি গন্ধর্বদের হাতে নিহত হয়েছে। এখন মৎস্যদেশে কোন যোগ্য সেনাপতি নেই। আপনি রাজী থাকলে, আমরা এখনই ঐ দেশের উপর আক্রমণ চালনা করতে পারি। কৌরব এবং ত্রিগর্তদের যৌথ আক্রমণে মৎস্যদেশ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমরা পর্যাপ্ত ধন, রত্ন এবং অসংখ্য গরু লুণ্ঠন করে আনতে পারি। আমাদের এই যৌথ আক্রমণের ফলে আমরা শুধু যে ধন, রত্ন, গরু পাবো তাই নয়, আমাদের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে আর কোন শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।"

সুশর্মার বক্তব্য কর্ণ সমর্থন করলেন। তারপর, দুর্যোধন, ভাই দুঃশাসনকে বললেন, "ভাই, তুমি সেনা প্রস্তুত কর। সুশর্মা ত্রিগর্তের সেনাবাহিনী নিয়ে একদিক থেকে মৎস্যদেশের উপর আক্রমণ চালনা করে ওখানকার গরু ধরে রাখবেন। পরের দিন, আমরা অন্য দিক থেকে মৎস্যদেশ আক্রমণ করব।"

এই পরিকল্পনা অনুসারে কৃষ্ণাসপ্তমীর দিন সুশর্মা নিজের সেনাদের নিয়ে মৎস্যদেশে গেলেন। অষ্টমীর দিন

কৌরব-সেনারাও বেরিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে বিরাটরাজার অধীনে মৎস্য-দেশে আত্মগোপন করে পাণ্ডবরা যে কাল যাপন করছিলেন তাঁদের সেই অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হল। কীচকের মৃত্যুর পর বিরাট রাজা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন।

সুশর্মা যথা সময়ে মৎস্যদেশের উপর আক্রমণ করে সমস্ত গরু হরণ করে রাখলেন। বিরাট দেশের অসহায় মানুষ, গোপালক সবাই সুশর্মার এই আক্রমণ ও গোহরণ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ বিরাটরাজাকে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করল গরুগুলোকে উদ্ধার করতে।

রাজা বিরাট দুঃসংবাদ শুনে নিজের ভাই শতানীক, মদিরাক্ষ প্রমুখকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হলেন। তাঁর আশ্রিত কঙ্ক, বল্লভ, তন্তিপাল ও গ্রন্থিকের জন্যেও চারটি রথ প্রস্তুত করালেন। তাঁর ধারণা তাঁরাও যুদ্ধ করতে পারে।

বিরাটের সেনাবাহিনী ত্রিগর্তসেনাদের আক্রমণ করতে যখন পেঁছাল তখন সন্ধ্যে হয়ে এলো। ঠিক সেই আলো-আঁধারি অবস্থায় যুদ্ধের নানান পর্যায়ের পর হঠাৎ এক সময় প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে সুশর্মা বিরাটকে বন্দী করে ফেল-লেন। ফলে বিরাটের সেনারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে পরামর্শ দিলেন, "বিরাট রাজাকে এমনভাবে ছাড়িয়ে আনতে হবে যেন শত্রুপক্ষ টের না পায় যে ওরা ভীমের হাতে পড়েছে। ভীম সুশর্মাকে আক্রমণ করলেন। ভীম যুদ্ধ করে সুশর্মার সেনাদের নাজেহাল করে ওদের পরাজিত করে বন্দী রাজা বিরাটকে মুক্ত করলেন এবং সুশর্মাকে বন্দী করে আনলেন। যুধিষ্ঠির সুশর্মাকে ছেড়ে দিতে ভীমকে নির্দেশ দিলেন।

রাজা বিরাট রাজধানীতে খবর পাঠালেন, তিনি জয়ী হয়েছেন, দেশবাসী যে-যার গরু ফেরত পাবে।

ঠিক তখনই দুর্যোধন এক বিশাল সেনাবাহিনী এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ও অশ্বত্থামা প্রমুখ বীর-দের নিয়ে অন্য দিক দিয়ে, আক্রমণ করে সমস্ত মৎসদেশের গরু হরণ করলেন।

গোপালকদের অধ্যক্ষ রথে চড়ে অতি তীব্র গতিতে বিরাট নগরে গিয়ে বিরাটের পুত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে বলল, "রাজ-কুমার, কৌরবরা আমাদের ছ হাজার গরু হরণ করেছে। আমাদের রাজা বলতেন, আপনি মহাবীর। এখন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের গরু উদ্ধার করুন। কৌরব সেনাদের সর্বনাশ করুন।"

বহু নারী পরিভূত অবস্থায় উত্তর বা ভূমিঞ্জয় যখন এই খবর পেলেন তখন তাঁর মনে হল তিনি সত্যি মহাবীর-যোদ্ধা; বললেন, "আরে, আমিতো সত্যি গরু উদ্ধার করতে পারতাম, কিন্তু মুস্কিল হল আমার যে যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ভাল সারথি নেই। তোমরা একটা ভাল সারথি খুঁজে বের কর। তোমরা একটা ভাল সারথি এনে দিলে আমিও দেখিয়ে দেব যুদ্ধ কাকে বলে।"

উত্তর যে নারীদের মধ্যে ছিলেন তাদের মাঝে বৃহন্নলা রূপী অর্জুনও ছিলেন। অর্জুন হিসেব কষে দেখলেন যে তাঁদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়েছে। তাই তিনি চুপি চুপি দ্রৌপদীকে বললেন, "তুমি রাজকুমার উত্তরকে বল যে আমি এক সময় অর্জুনের সারথি ছিলাম এবং তাঁর কাছে প্রশংসাও পেয়েছি। তুমি উত্তরকে বলে কয়ে আমাকে ওর সারথি করে নিতে বল।"

দ্রৌপদী সলজ্জভাবে উত্তরকে সেই কথা বললেন। প্রথমে উত্তর রাজী হন নি। বললেন, "ও নপুংসক, তাকে সারথি করে কি হবে।" কিন্তু পরক্ষণে দ্রৌপদীর পীড়াপীড়িতে বৃহন্নলাকে সারথি করতে উত্তর রাজী হলেন। উত্তরের কথা অনু-যায়ী তার বোন উত্তরা, বৃহন্নলাকে অনু-রোধ করল, তার ভাই উত্তরের সারথি

হতে। অর্জুন আগে রাজী না হওয়ার ভাণ করেন কিন্তু পরে সারথি হন।

যাত্রা করার সময় উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, "বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখদের পরাজিত করে আমাদের পুতুলের জন্য রঙ-বেরঙের নানান ধরণের সুন্দর সুন্দর কাপড় এনো।"

এ কথায় অর্জুন হাসতে হাসতে বললেন, "উত্তর যদি জয়ী হন, আমি নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর কাপড় আনব।"

উত্তরের রথ নগর পেরিয়ে এগিয়ে চলল। উত্তর অর্জুনকে বললেন "বৃহন্নলা, যে-দিকে কৌরব সেনারা আছে সেই দিকে রথ নিয়ে চল। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ঐ কৌরব সেনাদের বিতাড়িত করে গরু উদ্ধার করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা।"

অর্জুন বাতাসের গতিতে রথ চালালেন। কিছুক্ষণ পরে শ্মশানের কাছে গিয়ে উত্তর দেখতে পেলেন, বিরাট ঘন অরণ্যের মত বিশাল কৌরব সেনা ব্যূহ রচনা করে রয়েছে। যেন বিরাট কালো মাথার সমুদ্র! তাদের গর্জন শুনে মনে হয় যেন সমুদ্রের গর্জন। ভয়ে বিহ্বল এবং ভীত উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তর বললেন, "আমি, কৌরবদের সাথে যুদ্ধ করব না। ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার বাবা সমস্ত সেনা নিয়ে গেছেন। আমার কি আছে! আমি বালক। আমি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। আমি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহাবীরদের একা পরাজিত করব কি করে। বৃহন্নলা, তুমি ফিরে চল।" উত্তর আর্তনাদ করে উঠলেন।

অর্জুন বললেন, "রাজপুত্র, তোমার অবস্থা দেখে শত্রু সেনা হাসবে। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তুমি যাত্রা করার সময় বহু নারী-পুরুষকে গর্ব করে অনেক কথা বলেছ। এখন পালানো কি ভাল? ওরা যে গোধন হরণ করেছে তা উদ্ধার না করে ফিরে গেলে সবাই

তোমাকে ঠাট্টা করবে। আমি সোজা কৌরবদের মধ্যে রথ চালিয়ে দিচ্ছি। ওদের পরাজিত না করে আমি রাজধানী ফিরব না।"

উত্তর বললেন, "কৌরবরা আমাদের গোধন হরণ করুক, নারী-পুরুষ আমাকে ঠাট্টা করুক, আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করতে পারব না।" এই কথা বলে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তীর ধনুক ফেলে ছুটে পালাতে লাগলেন।

"ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণ করতে হয়, কিন্তু পিঠ দেখিয়ে পালাতে নেই।" এই কথা বলতে বলতে অর্জুন উত্তরের পিছনে ছুটতে লাগলেন।

অর্জুনের পোষাক এবং বেণী দেখে কয়েকজন কৌরব সেনা হাসতে লাগল।

অর্জুন একশো পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরে ফেললেন। উত্তর ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অর্জুন উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, "তুমি যদি না পার, আমি যুদ্ধ করব। আমি গোধন উদ্ধার করব, তুমি আমার সারথি হও।"

ভয়ে ভয়ে উত্তর রথ চালালেন। শমী বৃক্ষের কাছে রথ পৌঁছাল। তখন অর্জুন উত্তরকে বললেন, "তুমি এই গাছে উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বনী ও কবচ নামিয়ে আন।" নামানোর পর উত্তরের প্রশ্নের জবাবে অর্জুন বললেন, "এই শতস্বর্ণবিন্দু-যুক্ত সহস্র গোধা চিহ্নিত-ধনু অর্জুনের, এরই নাম গাণ্ডীব। এই ধনুর ধারণ স্থান স্বর্ণময়, এটা ভীমের। ইন্দ্রগোপ-চিহ্নিত এই ধনু যুধিষ্ঠিরের। সুবর্ণ-সূর্যচিহ্নিত এই ধনু নকুলের। স্বর্ণময় পতঙ্গচিহ্নিত এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ তূণ খড়্গ এখানেই আছে।"

উত্তর বললেন, "পাণ্ডবদের অস্ত্রতো এখানে আছে, কিন্তু ওঁরা কোথায়?"

"আমিই অর্জুন, সভাসদ কঙ্কই ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, রন্ধনকারী বল্লবই ভীম, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষই নকুল-সহদেব এবং সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী।

এখন বুঝতে পারছ, কীচক কেন মরেছে?" অর্জুন উত্তরকে বুঝিয়ে বললেন।

উত্তর অর্জুনের কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু অর্জুন তাঁর দশটি নাম কি ভাবে হয়েছে তা যখন বললেন তখন উত্তরের আর কোন সন্দেহ রইল না। তারপর, অর্জুনের পায়ে প্রণাম করে উত্তর বললেন, "হে অর্জুন, সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন পেয়েছি। আমি অজ্ঞতা-বশত আপনাকে যা বলেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আমার আর কোর ভয় নেই। যে দিকে বলবেন সেদিকেই আমি রথ চালাব।"

উত্তরের রথে যে সিংহধ্বজ ছিল তা নামিয়ে অর্জুন দৈবী মায়া ও কাঞ্চনময় ধ্বজ বসালেন। এই ধ্বজের উপরেই সিংহলাঙ্গুল বানর ছিল। কয়েকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিষ্ঠিত ছিল। শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথ চালাতে বললেন। অর্জুনের মহাশঙ্খের আওয়াজ শুনে রথের ঘোড়াগুলো একেবারে মাটিতে বসে পড়ল। উত্তরও সন্ত্রস্ত হলেন। অর্জুন লাগাম টেনে ঘোড়াদের ওঠালেন এবং উত্তরকে বললেন, "এবার দেখ কেমন করে আমি তোমার শত্রুদের নাশ করি।" অর্জুন হাতে তুলে নিলেন গাণ্ডীব।

অর্জুনের রথ থেকে আওয়াজ শুনে
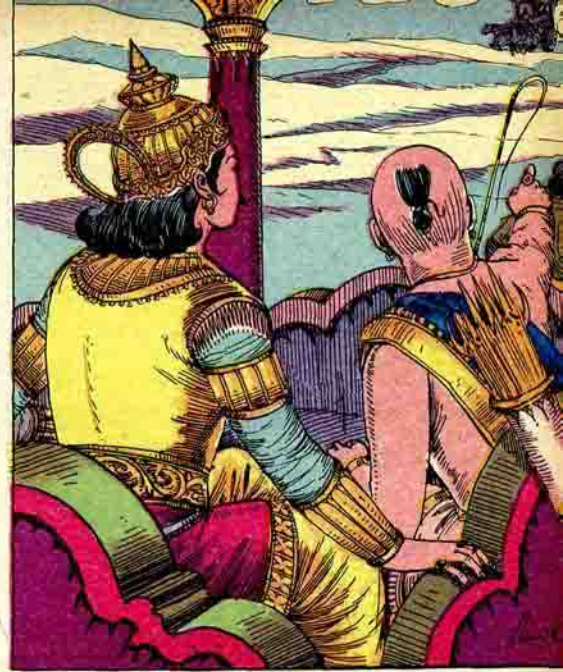
এবং নানান ধরনের দুর্লক্ষণ দেখে দ্রোণাচার্য বললেন, "দুর্যোধন, সামনে দিয়ে যিনি রথে চড়ে আসছেন তিনি নিশ্চয় অর্জুন।"

দুর্যোধন বললেন, "পাণ্ডবদের পণ ছিল, বার বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে কাটানো। এখন তের বছর পূর্ণ হয়নি অথচ অর্জুন বেরিয়ে এসেছে। অতএব, ওদের আবার বার বছর বন-বাসে কাটাতে হবে। হয়ত তারা লোভে পড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে। পূর্ণ-কাল হয়েছে কিনা তা একমাত্র পিতামহ ভীষ্ম বলতে পারেন। ত্রিগর্ত সেনার কাল অপরাহ্নে গোধন হরণ করার

কথা। বিরাট বা অর্জুন যিনিই আসুন না কেন, আমরা যুদ্ধ করবই।"

দ্রোণাচার্য বললেন, "অজ্ঞাতবাস শেষ না হলে অর্জুন আমাদের দর্শন দিতেন না। আজ, গোধন উদ্ধার না করে তিনি ফিরে যাবেন না।"

তারপর, জ্যোতিষ গণনা করে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, "তের বছর পূর্ণ হয়েছে বলেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ। তাঁরা লোভী নন। অন্যায় ভাবে রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্যোধান, যুদ্ধে একপক্ষের জয় বা পরাজয় হবেই। অর্জুন এসে পড়েছেন, এখন যুদ্ধ করবে অথবা ধর্মসম্মত কাজ করবে তা তাড়াতাড়ি ঠিক কর।"

দুর্যোধন বললেন, "পিতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। অতএব, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।"

"তাহলে, তুমি সেনার এক চতুর্থাংশ নিয়ে হস্তিনাপুর চলে যাও, আর এক-চতুর্থ ভাগ সেনাবাহিনী গরু নিয়ে চলে যাক। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সেনা নিয়ে আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ব্যূহ রচনা করে অর্জুনকে মোকাবিলা করব।" ভীষ্ম বললেন।

দুর্যোধন সহ সবাই তাই করতে রাজী হলেন। সবাই যার যা কর্তব্য তা করা শুরু করে দিলেন।

অর্জুন দেখলেন, কৌরর সেনার মধ্যে দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ প্রমুখ রয়েছেন কিন্তু দুর্যোধন নেই। তখন অর্জুন উত্তরকে বললেন, "এই সেনাদল এখন থাকুক, আগে দুর্যোধনের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। যে যুদ্ধে আকাঙ্খিত বস্তু নেই সেই যুদ্ধ যুদ্ধই নয়। আমরা দুর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করে আবার এদিকে আসব।"

অর্জুনকে, কৌরব সেনাদের দিকে না এসে অন্য দিকে যেতে দেখে দ্রোণচার্য বললেন, "উনি দুর্যোধন ছাড়া অন্য কাউকে চান না। চল আমরা পিছনে গিয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করি।" (চলবে)

শিবপুরাণ

তিন

প্রাচীনকালে সালঙ্কায়ন নামে এক মুনি ছিল। তার ছিল এক ছেলে। নাম তার শিলাদ। শিলাদের কোন সন্তান না থাকায় সে কৈলাসে গিয়ে পার্বতী-পরমেশ্বরের প্রতি ঘোর তপস্যা করেছিল। পার্বতী এবং পরমেশ্বর তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিলাদের কাছে এসে, তাকে দর্শন দিয়ে, তার ইচ্ছা জেনে, তাকে বলল, "তোমার সন্তান-প্রাপ্তি নেই। যাই হোক, একটা সন্তান তোমার হবে।"

শিলাদ তপস্যা সেরে নিজের আশ্রমে ফিরে এলো। অনেক বছর কেটে গেল কিন্তু কোন ছেলে না হওয়ায় সে যজ্ঞ করবে স্থির করল।

যজ্ঞ করার জন্য মাটি খোঁড়ার সময় সে একটি সুন্দর বালককে দেখতে পেল। শিলাদ ঐ বালকের নাম নন্দ রেখে, তাকে লালন-পালন করে বড় করল।

একবার মিত্র এবং বরুণ নামে দুই মুনি শিলাদের আশ্রমে এলো। নন্দকে দেখে মুনিদ্বয় ঐ বালকটিকে অল্পায়ুর ছেলে বলে বলল। এ-কথা শুনে শিলাদের দুঃখ হল।

নন্দ জানতে পারল তার পিতার দুশ্চিন্তার কারণ। সে তখন কেদারে গিয়ে পার্বতী এবং পরমেশ্বরের জন্য তপস্যা করল। অনেক কাল পরে পার্বতী এবং পরমেশ্বর নন্দকে দর্শন দিয়ে সে কী চায়, জানতে চাইল।

"হে পরমেশ্বর, আমি দীর্ঘায়ু হতে চাই। আমি আপনার ভক্ত হতে চাই। যশ পেতে চাই। আপনি আমাকে এই বর দিন।" নন্দ এইভাবে বর চাইল।

পার্বতী এবং পরমেশ্বর নন্দকে ঐ বর

দিয়ে তার নাম করণ করল নন্দীশ্বর এবং তাকে গণাধিপত্য দিল। শিব নন্দকে অভিষেক করতে নিজের জটাজূটের গঙ্গা জল ব্যবহার করল। ঐ অভিষিক্ত জল পাঁচটি নদীতে রূপান্তরিত হয়ে ত্রিস্রোতা, জটোদক, স্বর্ণোদক, জম্বূ এবং বৃষধ্বজ নামে প্রবাহিত হতে লাগল।

তারপর, পার্বতী এবং পরমেশ্বর নন্দী-শ্বরকে তাদের সাথে কৈলাশে নিয়ে গেল। পরবর্তীকালে নন্দীশ্বর মরুত্তের কন্যা সুকীর্তিকে বিয়ে করল। তারপর, নন্দী-শ্বরের বাপের বাড়ির দিকের সবাই শিবের নির্দেশ অনুসারে রুদ্রগণের মধ্যে মিলিত হল।

সৃষ্টির আদিতে ত্রিমূর্তির জন্ম হল। এই সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে বলল, "আমিই পরব্রহ্ম, তোমরা আমার সেবা কর।"

এই কথা শুনে ঈশ্বর রৌদ্র আকৃতি ধারণ করল। হুঙ্কার ছাড়ল। যার ফলে এক ভয়ঙ্কর আকৃতির মানুষ সৃষ্ট হল। তার ছিল তিনটি চোখ। তার চেহারা ছিল ফর্সা, আর ত্রিশূল ধারণ করা ছিল। চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল তার ডমরুর আওয়াজ। এই আওয়াজ করতে করতে সে জিজ্ঞেস করল, "হে পরমেশ্বর আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন কেন?"

"তুমি এই ব্রহ্মাকে শাস্তি দাও" ঈশ্বর আদেশ করল। পরক্ষণেই ঐ রাক্ষস-আকৃতি ব্রহ্মার পাঁচটি মাথা থেকে মাঝের

মাথা নিজের আঙ্গুলের নখ দিয়ে কেটে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। ব্রহ্মার মাথা যেখানে পড়ল সেই অঞ্চলকে ব্রহ্ম-কপাল বলা হয়। ব্রহ্মার মাথা যে অঞ্চলে কাটা হয়েছিল তারই নাম কাশী।

ঈশ্বর যাকে সৃষ্টি করল তার নাম কালভৈরব রেখে তাকে নিজের অঙ্গ রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করে নিল।

কিন্তু ব্রহ্ম-হত্যার পাপ ভয়ঙ্কর আকৃতি নিয়ে কালভৈরবের পিছু ছাড়ল না। এ-সব লক্ষ্য করে ঈশ্বর বলল, "হে কালভৈরব তুমি যদি ব্রহ্ম-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হতে চাও তো তীর্থ করতে করতে কাশী যাও, সেখানে তুমি এই পাপ থেকে মুক্তি পাবে।"

কালভৈরব তীর্থদর্শন করতে করতে কাশী গেল। গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হল। তারপর, কাশীতেই থেকে কাশীর ক্ষেত্রপাল হিসেবে পূজা পেতে লাগল।

প্রাচীন কালে ব্যাঘ্রপাদ নামে এক মুনি ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল বিমলা। ওরা দুজনেই শিব ভক্ত ছিল। শিবের আরাধণা করে ওরা দুজনে এক পুত্র সন্তান লাভ করল। তার নাম উপমন্যু।

বিমলার বাপের বাড়ির লোক বিমলা এবং উপমন্যুকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছুকাল পরে ওদের ব্যাঘ্রপাদের কাছে ফেরত দিয়ে গেল।

উপমন্যুর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সে একদিন তার মাকে বলল, "মা,

আমাকে দুধ দাও। দুধ খাব।"

"বাবা, আমরা যে দরিদ্র। তোমার মামারা ধনী, তাই ওরা তোমাকে দুধ-দই খাওয়াতে পেরেছে। আমি দুধ কোত্থেকে পাব, বাবা, আমরা যে গরীব।" বিমলা নিজের ছেলেকে বলল।

তারপর, বিমলা ছাতু জলে গুলে তাকে খেতে দিল কিন্তু উপমন্যু তা খেতে রাজী হল না।

"বাবা, আমিতো বলেছি, আমরা দরিদ্র, সব জেনেও তুই যদি কাঁদ তাহলে আমি কী করতে পারি।" উপমন্যুর মা বলল।

"মা আমাদের এই দারিদ্র দূর করার উপায় নেই?" উপমন্যু জিজ্ঞেস করল।

বিমলা নিজের ছেলেকে ব্যাঘ্রপাদের কাছে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার জানাল।

ব্যাঘ্রপাদ উপমন্যুকে শিব-পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র শিখিয়ে বলল, "বাবা, তুমি কৈলাশ পর্বতে গিয়ে এই মন্ত্র জপ করলে পার্বতী-পরমেশ্বর তোমাকে বর দেবেন।"

উপমন্যু কৈলাশপর্বতে গিয়ে শিব-পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র জপ করতে বসে গেল।

শিব বিকৃতরূপে উপমন্যুর কাছে এসে বলল, "এই জঙ্গলে তুমি একা কেন আছ? হিংস্র জানোয়ার তোমাকে শেষ করে ফেলবে। যাও, ফিরে যাও।"

"আমি তোমার পরামর্শ চাইনি। আমি জানি এটা ভয়ঙ্কর জঙ্গল। কিন্তু আমাকে কোন শক্তি বিচলিত করতে পারে না। আমার উপর পার্বতী-পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে।" এই কথা বলে উপমন্যু চোখ বুজল।

উপমন্যুর সাহস দেখে প্রসন্ন হয়ে পার্বতী এবং পরমেশ্বর দর্শন দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "কি বর চাও?"

উপমন্যু বলল, "পার্থিব লিঙ্গ-রূপে প্রত্যেক দিন আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুণ। এবং আমাকে সমস্ত প্রকারের ঐশ্বর্য প্রদান করুন।" পার্বতী এবং পরমেশ্বর তাকে দুটো বরই দিল। উপমন্যু বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখে দিন যাপন করতে লাগল। (চলবে)

৩/হিমচ্ছেদ-জাহাজ 'লেনিন'

সোভিয়েত দেশের হিমচ্ছেদ জাহাজের মধ্যে প্রধান জাহাজ 'লেনিন' পরমাণু শক্তির সাহায্যে চালিত। উত্তর দিশার দীর্ঘ রাত্রির কাল ছমাস। এই সময় ঐ জাহাজ সমুদ্রে বরফ কেটে কেটে পথ করে নিয়ে অগ্রসর হয়। তার পেছনে সমুদ্রে চলে অন্য জাহাজ। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিশার অনুসন্ধানীগোষ্ঠী এই জাহাজে থাকে। এতে যারা কাজ করে সেই সমস্ত লোকদের সব রকমের সুবিধা আছে। তারা অবসর সময়ে ঐ জাহাজে বসে সিনেমা দেখতে পারে, গান গাইতে পারে, ব্যায়াম করতে পারে, বই পড়তে পারে। তারা ইচ্ছা করলে নিজের পরিবার পরিজন অথবা আত্মীয় স্বজনদের সাথে বেতারের মাধ্যমে কথাও বলতে পারে।

ফটো : পি. ডি. অপ্টেকর
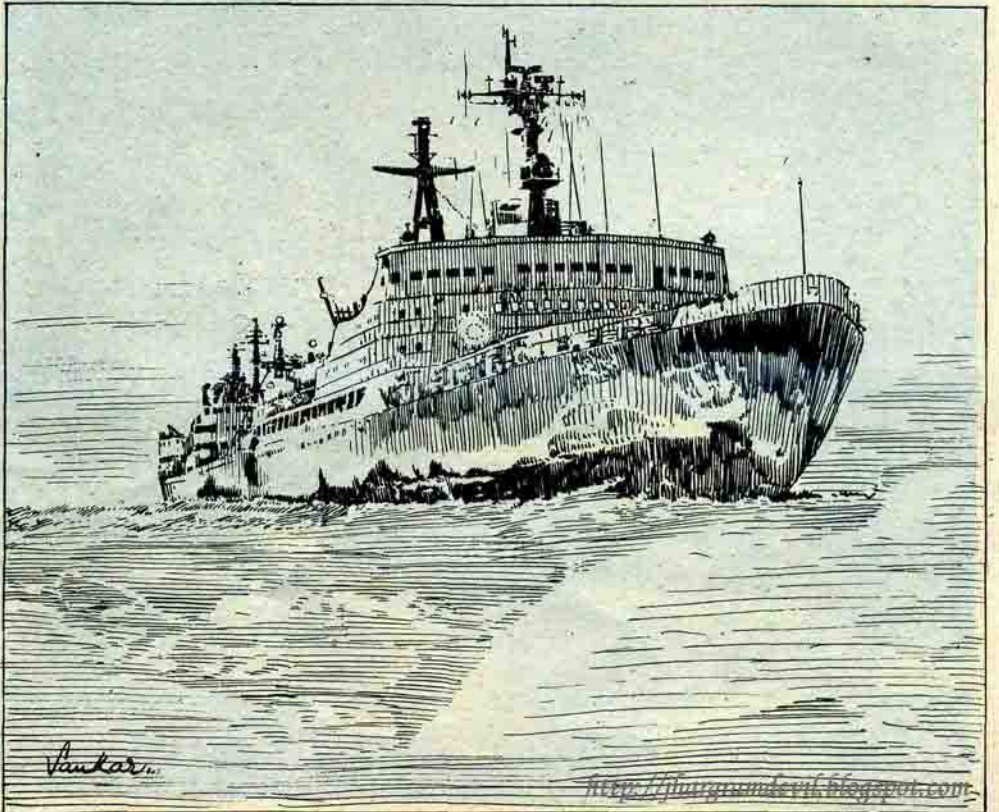
পুরস্কৃত
টীকা

তোমায় পছন্দ

পুরস্কার পেলেন
পুলক দাস

ফটো : পি. ডি. অস্টেকর

অরুণাচল
সোদপুর, ২৪ পরগণা

গ্রহণে আনন্দ

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা
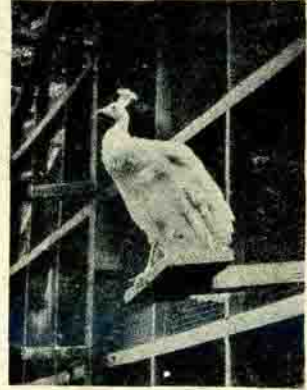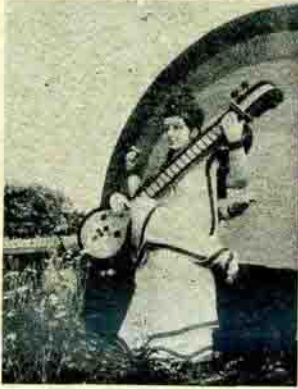
★ পরিচয়-টীকা বা নামকরণ ২০শে অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ পরিচয়-টীকা দু-তিনটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর টীকার মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয় টীকা সহ বড় ফটো ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — দুর্গা

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — ভক্ত

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

FOR PRECISION IN...

হাসির ছবি! স্বপ্নের ছবি!
দেখবে এসো মজার ছবি

রাধা, পূর্ণ ও তোমাদের প্রিয়
অন্যান্য ছবি ঘরে আসছে

Photo by : SURAJ N. SHARMA

CHANDAMAMA (Bengali) OCTOBER 1972 Regd. No. M. 9100

শিবপুরাণ